প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান না করে নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপিকা (ড.) মণিমালা দাস
উপাচার্য

পুনর্মুদ্রণ ঃ এপ্রিল, 2010

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় ঃ সমাজকর্ম **স্নাতকোত্তর স্তর**

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ MSW 11

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1, 2, 3	ঃ অধ্যাপক অশেষ মুস্তাফি	অধ্যাপক অজিতকুমার পতি
একক 4, 5	ঃ অধ্যাপক অসিত বসু	অধ্যাপক অজিতকুমার পতি
একক 6, 11, 12	ঃ অধ্যাপক অজিতকুমার পতি	অধ্যাপক অজিতকুমার পতি
একক 7	ঃ শ্রীমতী শিখা গঙ্গোপাধ্যায়	অধ্যাপক অজিতকুমার পতি
একক 8, 9, 10	ঃ শ্রী কনককান্তি সরকার	অধ্যাপক অজিতকুমার পতি

অনুবাদ

একক 1–12 শ্রী কনককান্তি সরকার

ঘোষণা

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

শ্রী সিতাংশু ভট্টাচার্য্য

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

MSW 11

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

একক	1	❑	সামাজিক সমস্যার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা	1 — 7
একক	2	❑	ভারতে পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থা ঘিরে সমস্যা, বিবাহে দ্বন্দ্ব, বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ ও ফলাফল, বিচ্ছিন্নতা, বাল্যবিবাহের সমস্যা, পণপ্রথা	8 — 17
একক	3	❑	সামাজিক নির্ভরশীলতার সমস্যা ঃ বার্ধক্য, অক্ষম, গৃহহীন	18 — 41
একক	4	❑	মহিলাদের সমস্যা ঃ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, সমস্যার রূপরেখা, মহিলাদের ওপর নির্যাতনের সমস্যা, সমস্যা মোকাবিলায় নীতি ও আইনি বিধান	42 — 50
একক	5	❑	নারী ও মেয়ে পাচার সমস্যা, তার প্রকৃতি, বিস্তৃতি, বিশালতা ও কারণ। পাচার নিবারণে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনি ব্যবস্থা	51 — 55
একক	6	❑	ভারতে গণিকাবৃত্তির সমস্যা	56 — 71
একক	7	❑	বিশেষ যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এমন শিশুদের সমস্যা	72 — 80
একক	8	❑	দারিদ্র্য	81 — 90
একক	9	❑	বেকারত্ব	91 — 100
একক	10	❑	জন বিস্ফোরণ	101 — 113
একক	11	❑	কৈশোর অপরাধ	114 — 126
একক	12	❑	যুবসম্প্রদায়ের সমস্যা	127 — 138

একক ১ ❑ সামাজিক সমস্যার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

গঠন

১.১ সামাজিক সমস্যার ধারণা

১.২ সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি

১.৩ সামাজিক সমস্যার কারণসমূহ

১.৪ সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ

১.৫ সামাজিক সমস্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

১.৬ অনুশীলনী

১.১ সামাজিক সমস্যার ধারণা

রাব্ এবং সেল্‌জিঙ্কের মতে একটি সামাজিক সমস্যা হল, "মানবিক সম্পর্কের একটি সমস্যা যা সত্যই সমাজকে সন্ত্রস্ত করে অথবা অনেক মানুষের গুরুত্বপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে বাধা প্রদান করে"। তারা আরও বলেছেন সংগঠিত সমাজ মানুষের মধ্যের সম্পর্ককে নির্দেশ দিতে ব্যর্থ হয় ; যখন সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি ভুল করতে থাকে, যখন এর আইনগুলি লঙ্ঘিত হয় ; যখন এর মূল্যবোধ প্রজন্মান্তরে ভেঙে পড়ে ; যখন চাহিদার কাঠামোও বিঘ্নিত হয় ; তখন যে সব সমস্যা ঘটে তাকে **সামাজিক সমস্যা** বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কিশোর অপরাধকে কেন্দ্র করে সমকালীন চিন্তা শুধুমাত্র অংশত প্রমাণ করতে পারে যে, বিচ্যুতি হল অপরাধের প্রবেশদ্বার। অথবা বিচ্যুতি হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভীতিপ্রদর্শনস্বরূপ। এটি আরও একটি ভয়ের কারণ যে সমাজ সঠিকভাবে তার যুব সম্প্রদায়ের কাছে ইতিবাচক সামাজিক মূল্যবোধ পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। একে অন্য কথায় সমাজের ভাঙন হিসাবেও ব্যাখ্যা করা যায়।

সামাজিক সমস্যাকে অন্যভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। ওয়ালশ্ এবং কার্ফের মতে সামাজিক সমস্যা হচ্ছে সামাজিক আদর্শের থেকে বিচ্যুতি যা গোষ্ঠীর প্রচেষ্টার ফলে সমাধানযোগ্য হতে পারে। এই সংজ্ঞার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে।

১. এমন একটা অবস্থা যা আদর্শ অবস্থার থেকে তুলনায় হীনতর। অর্থাৎ যা অবাঞ্ছিত বা অস্বাভাবিক এবং ২. গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টায় যা প্রতিকারের উপায়স্বরূপ।

মাদকের অপব্যবহার, অত্যধিক সুরাপান, সন্ত্রাসবাদ, দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং অপরাধ ব্যক্তিগত সমস্যা নয় কিন্তু এগুলি সাধারণ জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে এর বিশ্লেষণ ব্যক্তির/গোষ্ঠীর পরিবেশের মধ্যেই নিহিত থাকে। এর অপরপক্ষে, জনসাধারণের জন্য তাই যা সমাজকে সামগ্রিকভাবে বা সামাজিক জীবনের কাঠামোকে প্রভাবিত করে। সমাজতাত্ত্বিকের উদ্দেশ্য হল কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক কাঠামোতেও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয় তা বোঝা, বিভিন্ন সামাজিক আন্তঃসম্পর্কের আদর্শরূপ বোঝা এবং কীভাবে মানুষ এর দ্বারা প্রভাবিত হন, ও কীভাবে সামাজিক ব্যবস্থাকে বোঝার জন্য পুনর্গঠন ও পুনর্সংগঠিত করা প্রয়োজন তাও পর্যবেক্ষণ করা।

১.২ সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি

সামাজিক সমস্যা হল ব্যবহারিক বিন্যাস অথবা অবস্থা যা সামাজিক পদ্ধতির মধ্য থেকে উঠে আসে এবং যা আপত্তিকর অথবা অনভিপ্রেত বলে সমাজের অনেক সদস্যের দ্বারা বিবেচিত হয়। এবং যা সেই সদস্যরা মনে করে সংশোধনমূলক নীতি, পরিকল্পনা এবং পরিষেবা এই সমস্যাকে মোকাবিলা করতে প্রয়োজনীয়।

সামাজিক সমস্যা তখনই উদ্ভূত হয় যখন সম্প্রদায়ের বেশি সংখ্যক সদস্য যৌথভাবে যাকে আপত্তিকর বলে বিবেচনা করে। এভাবে যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা নিজ নিন্দনীয় বলে মনে করে না সেগুলিকে সামাজিক সমস্যা বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মদ্যপান করাকে যদি সমাজ আপত্তিকর না মনে করে, তাহলে একে কখনোই সামাজিক সমস্যা বলা যাবে না। কিন্তু যখন সমাজ মদ্যপানের অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলিকে আলোচনা করে এবং চিহ্নিত করে, এর ফলাফল এবং খারাপ দিক নিয়ে গবেষণা করে, নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী গ্রহণ করে তখন একে সামাজিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, এমনকি যদি প্রকৃত অবস্থা পরিবর্তিত নাও হয়।

সামাজিক সমস্যার পরিবর্তন ঘটে তখনই যখন কোনো বিশেষ ব্যবহারের আদর্শরূপের ভিন্ন বিশ্লেষণ হয়। যেমন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত মানসিক অসুস্থতাকে পাগলামি বলেই দেখা হত কিন্তু এখন এটিকে বিচ্যুত ব্যবহারের একটি রূপ হিসাবে দেখা হয় যার মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক চিকিৎসার প্রয়োজন।

গণমাধ্যমগুলি (যেমন, খবরের কাগজ, টেলিভিশন, রেডিয়ো ইত্যাদি) সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে ও প্রয়োজনীয় তৎপরতা সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক সমস্যাকে সমাজের মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রে জাতিদ্বন্দ্বের সমস্যা ভারতের অস্পৃশ্যতার সমস্যার থেকে আলাদা।

সামাজিক সমস্যা ঐতিহাসিকভাবে ভিন্নতর। সমকালীন সামাজিক সমস্যাই সমাজের মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকে।

সামাজিক সমস্যাগুলিকে গোষ্ঠীবদ্ধ পদ্ধতি এবং সামাজিক সম্পর্কের প্রভাবের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

এভাবে, সামাজিক সমস্যার প্রকৃতিকে নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়।

★ সমস্ত সামাজিক সমস্যাই আদর্শ অবস্থা থেকে বিচ্যুত ঘটনা।

★ সমস্ত সামাজিক সমস্যারই উদ্ভবের একটি সাধারণ ভিত্তি আছে।

★ সমস্ত সামাজিক সমস্যাই সমাজ থেকে উদ্ভূত।

★ সমস্ত সামাজিক সমস্যা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

★ সমস্ত সামাজিক সমস্যার ফলাফলই সামাজিক। অর্থাৎ তারা সমাজের সব অংশকে প্রভাবিত করে।

★ সামাজিক সমস্যার দায়ও সামাজিক। অর্থাৎ, এর সমাধানের জন্য যৌথ প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

১.৩ সামাজিক সমস্যার কারণসমূহ

অস্বাভাবিক সামাজিক অবস্থা থেকেই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। এই সমস্যাসমূহ যে-কোনো ধরনের সমাজেই ঘটে—সরল (ক্ষুদ্রাকার, বিচ্ছিন্ন, সমরূপ, যার মধ্যে দৃঢ় গোষ্ঠীঐক্য থাকে এবং যা খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়) এমনকি জটিল (যেখানে নৈর্ব্যক্তিক গৌণ সম্পর্ক দেখা যায়, নামহীন ব্যক্তি, একাকীত্ব, উচ্চহারে সচলতা, প্রবলমাত্রায় বিশেষীকরণ এবং যেখানে পরিবর্তন হয় দ্রুত)। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে যেখানেই সম্পর্ক প্রভাবিত হয় কতগুলি গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের মধ্যে, যেখানে মানিয়ে চলার প্রবণতা কম এবং দ্বন্দ্ব ঘটে থাকে সেখানেই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়।

রিয়েনহার্ট সামাজিক সমস্যার গঠনে তিনটি উপাদানের ওপর আলোকপাত করেছেন।

(১) স্বার্থের পৃথকীকরণ ও সংখ্যাবৃদ্ধি এবং তার কার্যাবলি ঃ

মানুষের সমাজেও যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার স্বার্থের সংঘাত হয়, সেখানে যত বেশি অংশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ততই ত্রুটিপূর্ণ সমন্বয় ঘটে। এই নীতিটিতে যন্ত্রাংশের সঙ্গে মানবিক সমাজের মিল পাওয়া যায়। অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক অপরাধ সেই সামাজিক সমস্যা যা বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণি স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে গড়ে ওঠে।

(২) সভ্যতার উন্নতি বা সামাজিক পরিবর্তনের পরিসংখ্যার ত্বরান্বিতকরণ ঃ

বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক নবপ্রবর্তনের ফলে সামাজিক পরিবর্তনের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যন্ত্রের নবপ্রবর্তনের ফলে অনেক প্রচলিত কর্মক্ষেত্রের বিলুপ্তি ঘটেছে এবং যার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রব্রজন ঘটেছে এবং শ্রেণিদ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটেছে। অর্থাৎ বৈপ্লবিক আবিষ্কারের ফলে যে কাঠামোগত ও কার্যকলাপের অপসমন্বয় ঘটেছে তার থেকেই নানা সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে।

(৩) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টির উন্নতি ঃ

প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ বোঝার জন্য যখন থেকে মানুষের অন্তর্দৃষ্টির উন্নতি ঘটেছে তখন থেকে যেসব বিষয়বস্তুকে আগে সরল মনে করা হত তা এখন মানুষ ও সমাজের প্রাকৃতিক নানান অবস্থার ফলস্বরূপ বলে অভিহিত করা হয়।

১.৪ সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ

ক্লারেন্স মার্শাল সামাজিক সমস্যার উৎস প্রসঙ্গে চার ধরনের রূপের উল্লেখ করেছেন।

(i) প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে যেগুলি উদ্ভূত।

(ii) যেগুলি জনসম্প্রদায়ের প্রকৃতি ও বিন্যাসের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে।

(iii) যেগুলির উৎস ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক সংগঠনের জন্য। এবং

(iv) সমাজের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্বের ফলে যেগুলি সৃষ্টি হয়।

ফ্যুলার এবং মাইয়ার্স তিন ধরনের সামাজিক সমস্যার উল্লেখ করেছেন—

(ক) প্রাকৃতিক সমস্যা ঃ যদিও এই সমস্যাগুলি সমাজকে প্রভাবিত করে তবুও এর কারণসমূহ মূল্যবোধের দ্বন্দ্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না। যেমন—বন্যা বা খরা।

(খ) উন্নতিসাধক সমস্যা ঃ এই সমস্যাগুলির প্রভাব সম্বন্ধে ঐক্যমত থাকলেও এর সমাধান সম্বন্ধে মতপার্থক্য আছে। যেমন—অপরাধ, দারিদ্র্য এবং মাদকাসক্তি।

(গ) নীতিগত সমস্যা ঃ এই সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ সম্বন্ধে কোনো ঐক্যমত নেই। যেমন—জুয়াখেলা বা বিবাহবিচ্ছেদ।

১.৫ সামাজিক সমস্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

যদিও সামাজিক সমস্যা অত্যন্ত মনোগত একটি বিষয় তবুও এগুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করা যায়। সমস্ত ধরনের সামাজিক সমস্যার বিশ্বজনীন পর্যালোচনার জন্য কিছু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

(ক) সামাজিক অসংগঠন আলোচনা পদ্ধতি ঃ সমাজের একটি অবস্থাকে বলে সামাজিক অসংগঠন। এই অবস্থায় কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বা সামাজিক স্থিতাবস্থা বা বিধিবৎ বা অবিধিবৎ আদর্শ কাঠামোটি ভেঙে পরে। এই সময়ে সহযোগিতার, সাধারণ মূল্যবোধ, ঐক্য, নিয়মানুবর্তিতা ও ভবিষ্যদ্‌বাণী করার সুযোগের অভাব ঘটে।

শক্তির, সামাজিক কাঠামো ইত্যাদির সামাজিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটলে সামাজিক অসংগঠন ঘটে। এর ফলে, পূর্ববর্তী কাঠামোবিন্যাস প্রযুক্ত থাকে না এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃত রূপগুলিও আগের মতো কার্যকরী থাকে না। সমাজের এই অরাজক অবস্থা, যার থেকে নীতিহীনতা, ভূমিকা দ্বন্দ্ব, সামাজিক দ্বন্দ্ব, নীতিভ্রষ্টতার সৃষ্টি হয়। এবং এগুলি বাড়লেই সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

পরিবারের অন্তর্বর্তী এবং বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে যে প্রচলিত নিয়ম ছিল সেগুলির অবলুপ্তি ঘটছে। এর ফলে, অনেক মানুষ অসুখী হয় ও নৈরাশ্যে ভুগতে শুরু করে। এটি একটি সামাজিক অসংগঠনের উদাহরণ। যেখানে জীবনের প্রাথমিক কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় যার জন্য ঐতিহ্যবাহী নীতিসমূহ ভেঙে পড়ে। এর ফলে অসন্তোষ ও মোহমুক্তি ঘটে।

(খ) **সাংস্কৃতিক বিলম্বন আলোচনা পদ্ধতি ঃ** সাংস্কৃতিক বিলম্বন এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে সাংস্কৃতিক কিছু অংশে পরিবর্তন দ্রুত হয় কিন্তু তুলনায় অন্য সংযুক্ত অংশে একই হারে পরিবর্তন ঘটে না। ফলে, ঐক্যসাধনে এবং সংস্কৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বিঘ্ন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, শিল্প সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পরিবর্তনের জন্য বস্তুগত সংস্কৃতি দ্রুত হারে পরিবর্তিত হয় অবস্তুগত সংস্কৃতির তুলনায়। সাংস্কৃতিক বিলম্বন তত্ত্বে মনে করা হয় যে বিশেষত আধুনিক সমাজে, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের দ্রুত হারের তুলনায় রাজনৈতিক, শিক্ষাগত, পরিবারগত ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন ধীরে হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক বিলম্বন কী ভূমিকা নেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শিল্পায়নের দ্রুতহারের জন্য কিছু মানুষ জাতি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থায় এতটাই প্রভাবিত ছিলেন যে তারা অন্য নীচু জাতিভুক্ত মানুষের সঙ্গে কাজ করতে চাইতেন না এবং সেক্ষেত্রে দরিদ্র ও বেকার থাকতেও তাদের আপত্তি ছিল না। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ সে কারণে সাংস্কৃতিক বিলম্বনের শিকার বলা যেতে পারে।

(গ) **মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব আলোচনা পদ্ধতি ঃ** মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যবহারের সাধারণ নীতি। এই মূল্যবোধের প্রতি গোষ্ঠীর সমস্ত মানুষ আবেগমথিত থাকে এবং এই মূল্যবোধ মেনে চলার ক্ষেত্রে গভীর সদর্থক দায়বদ্ধতা উপলব্ধি করে। এবং প্রত্যেক কাজ ও ক্রিয়াকলাপকে তারা ওই মূল্যবোধের সাপেক্ষে বিচার করে থাকে। গোষ্ঠীর দ্বারা স্বীকৃত মূল্যবোধকে ওই গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্য মেনে চলবেন এটাই মনে করা হয়। সুতরাং মূল্যবোধ হয় ব্যবহারের একটি সাধারণ নীতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে সাম্য বিচারব্যবস্থা বা নীতিপ্রণয়ন, স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ, সচলতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং সম্প্রদায়ের প্রতি আবেগ ইত্যাদির কথা। মূল্যবোধ দ্বন্দ্বের প্রবক্তারা যেমন—ওয়ালার, ফুলার, কিউবার ও হার্পার মনে করেন যে, সামাজিক সমস্যার উৎস ও উন্নতির জন্য মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব অত্যন্ত জরুরি। ওয়ালার যেমন উল্লেখ করেছেন সাংগঠনিক ও মানবিক মূল্যবোধের কথা। সাংগঠনিক মূল্যবোধ ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর জোড় দেয় তেমন অন্যের কষ্টের মীমাংসার সুরাহার কথা বলে।

(ঘ) **ব্যক্তিগত বিচ্যুতির আলোচনা পদ্ধতি ঃ** সামাজিক নীতির অননুগমনকেই বিচ্যুতি বলে। এই ব্যবহার অস্বাভাবিক ব্যবহারের সঙ্গে তুলনীয় নয় কারণ অস্বাভাবিক ব্যবহার মানসিক রোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং যারা সামাজিক নীতির থেকে বিচ্যুত হন তারা যে মানসিক অসুস্থতারই শিকার

হবেন এমন কোনো কথা নেই। সামাজিক সমস্যার আলোচনায় ব্যক্তিগত বিচ্যুতিতত্ত্ব মনে করে যে, যেসব নীতি ভেঙে পড়ছে এবং এর ফলে যে পরিবর্তন হচ্ছে তা আলোচনার দরকার আছে। এই তত্ত্বে বিচ্যুতিকারীর ব্যবহারের পেছনে প্রেরণার আলোচনা দরকার বলে মনে করা হয় কারণ এর ফলেই সামাজিক সমস্যা ঘটে।

(ঙ) **বিধিশূন্যতার তত্ত্ব** ঃ মার্টনের দ্বারা প্রযুক্ত এই তত্ত্বে বলা হয় যে বিধিশূন্যতা এমন একটি সামাজিক অবস্থা যেখানে আপেক্ষিকভাবে মূল্যবোধ, নীতির অভাব বা অস্পষ্টতা আছে। মার্টন বলেছেন, "the social problem arises not from people failing to live upto the requirements of then social statuses but from the faulty organization of these statuses into a reasonably coherent social system." বলতে একদিকে সামাজিক ঐক্য যৌথ আদর্শের ঐক্যসাধন বোঝায় অন্যদিকে বিধিশূন্যতা হল অস্পষ্টতা, নিরাপত্তাহীনতা, নীতিহীনতা পূর্ণ একটি অবস্থা। মার্টনের মতে লক্ষ্য ও উপায় এই দুই-এর মধ্যে অসংগতি ও ফলস্বরূপ যে চাপ সৃষ্টির জন্য সাংস্কৃতিকভাবে স্বীকৃত লক্ষ্য ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত উপায়ের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতার ঘাটতি ঘটে তাকেই বিধিশূন্যতা বলা যায়। মার্টনের মতে মানুষ এই অসংগতির সঙ্গে মানিয়ে নেয় এক সাংস্কৃতিকভাবে স্বীকৃত লক্ষ্য বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত উপায় অথবা দুটিকেই বাতিল করে দিয়ে।

উপসংহার ঃ শেষে বলা যেতে পারে যে, সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণে সমাজতাত্ত্বিক-এর ভূমিকা হলো সম্বন্ধে সাধারণ সচেতনতা গড়ে তোলা, সামাজিক সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করা, তত্ত্ব গঠন করা, এই সমস্যাসমূহের প্রভাব আলোচনা করা এবং এর কোনো পরিবর্তন সম্বন্ধে অন্বেষণ করা যাতে সমস্যার সমাধান করা যায়।

১.৬ অনুশীলনী

(i) সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা দিন। এর প্রকৃতি ও কারণ ব্যাখ্যা করুন।

(ii) সামাজিক সমস্যার তাত্ত্বিক আলোচনা করুন।

একক ২ ❑ ভারতে পরিবার ও বিবাহব্যবস্থা ঘিরে সমস্যা, বিবাহে দ্বন্দ্ব, বিবাহবিচ্ছেদের কারণ ও ফলাফল, বিচ্ছিন্নতা, বাল্যবিবাহের সমস্যা, পণপ্রথা

গঠন

২.১ ভারতে পরিবার ও বিবাহব্যবস্থা ঘিরে সমস্যা

২.২ বিবাহে দ্বন্দ্ব, বিবাহবিচ্ছেদের কারণ ও ফলাফল এবং বিচ্ছিন্নতা

২.৩ বাল্যবিবাহ

২.৪ পণপ্রথা

২.৫ অনুশীলনী

২.১ ভারতে পরিবার ও বিবাহব্যবস্থা ঘিরে সমস্যা

সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক গোষ্ঠী হল পরিবার। এটি সমাজের সরলতম এবং প্রাথমিক একটি রূপ। প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবার হল বিশ্বজনীন। পরিবারব্যবস্থা চিরস্থায়ী এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পরিব্যাপক। ম্যাকাইভারের মতে—পরিবার হল "a group defined by sex relationship sufficiently precise and ending to provide for the procreation and upbringing of children."

বিবাহ বলতে বোঝায় এমন এক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজস্বীকৃত এক সম্বন্ধ গড়ে তোলা যায় একজন পুরুষ ও একজন মহিলা বা অনেক পুরুষ ও এক মহিলা বা অনেক মহিলা ও এক পুরুষের মধ্যে, যার উদ্দেশ্য হল স্থায়ী যৌনসম্পর্ক গড়ে তোলা যাতে ভবিষ্যতে পিতৃ-মাতৃত্ব প্রদান সম্ভব হয়। বিবাহ হল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপন করা যাতে তাদের মধ্যে সমাজস্বীকৃত ও সমর্থিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের মিথস্ক্রিয়া গড়ে ওঠে এবং যে সম্পর্ক থেকে সৃষ্ট সন্তানদের সমাজে বৈধ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। বিবাহকে অন্যভাবে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে বলতে হয় এটি একটি এমন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে দু-য়ের বেশি ব্যক্তির মধ্যে সমাজস্বীকৃত উপায়ে পরিবার গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

প্রাক্ শিল্পভিত্তিক বা কৃষিপ্রধান সমাজে বেশিরভাগ দ্রব্যাদির উৎপাদন সংগঠিত হত পরিবারের পিতামাতা, সন্তানাদি ও অন্যান্য সদস্যের মধ্য দিয়ে। যেহেতু এই সময়ে বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যিক সমস্ত দ্রব্যাদির উৎপাদনকেন্দ্র ছিল পরিবার (মাঝে মাঝে কিন্তু বেশি উৎপাদন হত কাছাকাছি এলাকায় থাকা বাজারের জন্য) সেহেতু ওই সময়ের পরিবার ছিল ভোগ্য উৎপাদনকারী একক বা উৎপাদনের প্রাথমিক একক।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছোটো ছোটো কৃষিভিত্তিক পরিবারগুলি ধীরে ধীরে তাদের জমি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করলে, পরিবারগুলি বাইরের কর্মসংস্থানের ওপর বেশি নির্ভর হতে থাকে যার ফলে তারা ক্রমশ তাদের শ্রম বড়ো বড়ো জোতদারের কাছে বিক্রি করতে শুরু করে। তবে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে দ্রব্যাদির উৎপাদন ও সংগঠনে বড়ো ধরনের পরিবর্তন আসে কলকারখানাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। মানুষ আগে যে দ্রব্যাদি তাদের পরিবারের ভেতরেই উৎপাদন করত তা তারা তাদের অর্জিত আয়ের মাধ্যমে কেনার আশা করতে শুরু করে।

ভারতেও সনাতনী যৌথ পরিবার ছিল উৎপাদন ও ভোগের একটি একক। বর্তমানে পেশার বিভিন্নতায়, যৌথ পরিবারের নানা সমস্যায় তারা ভাগ্যান্বেষণে পরিবারের বাইরে কাজ খুঁজতে শুরু করছে। আজকের পরিবার শুধুই ভোগের একটি এককে পরিবর্তিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রযুক্তি নির্ভর সমাজে, পরিবারগুলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিক কাজ হল ভোগের একক হিসাবে। পরিবার ও কর্মক্ষেত্রের পৃথকীকরণের ফলে মেয়েরা সামাজিক উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক মহিলা শুধুমাত্র গৃহকর্ত্রী হয়ে গেছেন।

অনেক পশ্চিমি দেশে, যৌন সম্পর্কের নীতি বেশ শিথিল হয়ে পড়েছে। পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় সেখানে প্রাক্‌বিবাহ যৌন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তন এসেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রাপ্তবয়স্কদের জগতের প্রথামাফিক আদর্শের সঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্কদের ব্যবহারের একটা বড়ো ফাঁক ধরা পড়ে। এই পরিবর্তনের একটি কারণ হল এই যে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের প্রবেশ ক্রমশ বাড়ছে এবং যৌন ভূমিকায় (sex roles) ছোটো ছোটো পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটেই চলছে ভারতে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে। মূলত সেইসব মহিলারাই বাড়ির বাইরে কাজ করতে আসেন যাদের স্বামীরা তাদের সাহায্য করতে পারেন না বা অনিচ্ছুক। আজও, কর্মরত মহিলারা বেশিরভাগই আসেন উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে। ভারতে, মেয়েদের শিক্ষার ওপর বিয়ের বয়সে বৃদ্ধি, মেয়েদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান, সামাজিক স্বীকৃতি বিশেষ করে অবিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রে ইত্যাদি ব্যাপারে আরও বেশি করে জোর দেওয়া হচ্ছে ; এর ফলে পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসছে।

ভারতে যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনগুলি পরিবার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেনি। তবে পরিবারের কাঠামো বা কার্যাবলি বা স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করেছে। মিলটন সিঙ্গার পাঁচটি উপাদানের উল্লেখ করেছেন যেগুলির প্রভাব পরিবারের ওপর সবচেয়ে বেশি। এগুলি হল শিক্ষা, শিল্পায়ন, নগরায়ণ, বিবাহব্যবস্থায় পরিবর্তন বিশেষ করে বিয়ের বয়স এবং আইনি ব্যবস্থার ফলে পরিবারের ওপর প্রভাব পড়েছে।

হয়তো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল বিশেষ করে পশ্চিমি দেশগুলির ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের হারে নাটকীয় বৃদ্ধি। শিল্প সমাজে নগর এলাকার বিবাহবিচ্ছেদের ক্রমবর্ধমান হারের প্রতিফলনস্বরূপ—

(১) ধর্ম থেকে বিবাহের বিচ্ছিন্নতা।

(২) নারী জাগরণ।

(৩) মূল্যবোধের পরিবর্তন যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত খুশির ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে।

পরিবারের বিশেষজ্ঞরা বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের ক্রমবর্ধমানতার কথা ভেঙে বিবাহ প্রতিষ্ঠানটিকে "সেরিয়াল ম্যারেজ" (serial marriage) অ্যাখ্যা দিয়েছেন। বিবাহবিচ্ছেদের ওপর ব্যক্তিগত, নৈতিক বিচার যাই হোক না কেন, অনেকেই একে সামাজিক পরিবর্তনের স্বাভাবিক ফল বলে মনে করতে শুরু করেছেন। এর বৃদ্ধির জন্য যে উপাদানগুলি দায়ী সেগুলি হল, ধর্মনিরপেক্ষতা, নারী জাগরণ, মহিলাদের পরিবারের বাইরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ছোটো পরিবার গড়ে তোলার প্রবণতা। শিল্পোন্নত সমাজে, নববিবাহিত দম্পতি কোনো অপ্রীতিকর অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চান না। বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত মালিকানায় উপদেষ্টা (counsellor) আছেন যারা কোনো বিবাহবিচ্ছিন্ন হতে ইচ্ছুক দম্পতিকে ওই সময়ের মধ্য দিয়ে পার হতে সাহায্য করেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, বিবাহবিচ্ছেদ এখন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেতে চলেছে। বিবাহ ও পরিবারের আরও একটি বিকল্প হল অবিবাহিত থাকা। এই পরিস্থিতিও এখন আর সামাজিক কলঙ্ক হিসাবে গণ্য হয় না।

সমাজান্তরে পরিবারের কার্যাবলির ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা যায়। অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবারের পূর্বতন কার্যাবলিকে গ্রহণ করেছে সেগুলি হল—ধর্ম, শিক্ষা, বৃদ্ধাবাস। এগুলি পশ্চিমি দেশগুলির পক্ষে যতটা সত্যি ভারতের ক্ষেত্রে ততটা নয়। তবে আধুনিক যুগের নানা পরিবর্তন প্রায় প্রত্যেক সমাজকেই

এখন প্রভাবিত করছে। সে কারণে পরিবার, যা কিনা সমাজের ভিত্তি তা এই ধরনের প্রভাব থেকে কখনোই বিমুক্ত নয়।

২.২ বিবাহে দ্বন্দ্ব, বিবাহবিচ্ছেদের কারণ ও ফলাফল এবং বিচ্ছিন্নতা

আধুনিক পরিবার ব্যবস্থা (সবচেয়ে আকর্ষণীয় সমস্যা যার) সম্মুখীন হয় তা হল এর অস্থায়িত্ব। সনাতনী পরিবার ছিল স্থায়ী ব্যবস্থা, যার ভাঙনের কথা খুব কমই ভাবা যেত এবং যা খুব সহজসাধ্যও ছিল না। সনাতনী পরিবার সারা বিশ্বে একটি একক হিসাবে প্রতিভাত হত। পরিবারের বাইরে মহিলাদের কোনো আশ্রয় ছিল না। পরিবারের সদস্যদের পেশা স্থিরীকৃত থাকত এবং প্রজন্মান্তরে তা প্রবাহিত হত। এই সমাজে সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রও সীমিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সদস্যদের ওপর পরিবারের নিয়ন্ত্রণ অনেক কমে এসেছে। যুবক প্রজন্ম তাদের জীবনে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রভাব পছন্দ করে না। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঐক্যেরও অভাব ঘটছে। একে অপরের ওপর বিশ্বাসও কমে আসছে। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের প্রবেশের ফলে পরিবারে সন্তানদের উন্নতি বিঘ্নিত হচ্ছে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস বা ভরসাও কমে আসছে। বিবাহের বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। যৌন সম্পর্কে সনাতনী আনুগত্যও বিপরীতভাবে প্রভাবিত করছে। প্রাক্ বিবাহও বহির্বিবাহ সম্পর্ক ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যৌন অনৈক্যও আছে। পারিবারিক পেশা বা শিল্পের কোনো ক্ষেত্র আর নেই। একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যরা আলাদা আলাদা পেশায় নিযুক্ত। সনাতনী পরিবার ব্যবস্থার মেরুদণ্ডস্বরূপ যৌথ অংশগ্রহণ, বিশেষীকৃত বিভিন্ন সংস্থার বৃদ্ধির ফলে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। পরিবারের প্রাথমিক চরিত্রেও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে আধুনিক পরিবারের কাঠামোগত ও কার্যাবলির হ্রাসমানতার ফলে। যেমন—রাষ্ট্র প্রাক্ জন্মসংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, শিশুর শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়েছে, দামি চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, কারখানা ও অফিসে কর্মসৃষ্টি হচ্ছে, অবসরকালীন আমোদ-প্রমোদের জন্য ক্লাব ইত্যাদি গড়ে উঠছে। যদি মানুষ পরিবার ব্যবস্থার বাইরে শিক্ষার ক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা পায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক পরিবার ব্যবস্থাই পরিবারের ভাঙনের প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে।

বিবাহবিচ্ছেদ কেন হয়?

বিবাহিত দম্পতির মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা প্রক্রিয়া বহুদিন ধরে চলার পরই তার ফলস্বরূপ বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। খুব স্পষ্ট ভাষায় বলা শক্ত বিবাহবিচ্ছেদের সঠিক কারণগুলি কী কী—কারণ পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার চরম ক্ষেত্রেও অনেক সময় বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে না। তবে বলা যেতে পারে যে, সংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামোর কিছুদিকের জন্য বিবাহবিচ্ছেদের হারের বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এই দিকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) **সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়** ঃ কোর্টে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য উপযোগী যে কারণগুলির উল্লেখ করা হয় তা বিবিধ। তার মধ্যে মুখ্য হল—যৌন অনৈতিকতা, নৃশংসতা, অসহযোগিতা, বন্ধ্যাত্ব, যৌন রোগ ইত্যাদি। এগুলি যদিও বিবাহবিচ্ছেদের বহির্কারণ। এর অন্তর্নিহিত কারণ হল সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় যার ওপর আধুনিক পরিবার ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে। আজকাল ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য বিবাহ ঘটে, কখনোই আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য নয়। আধুনিক পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুবাদী এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক যা পরিবারের ভিত্তির শক্তিকে শিথিল করে দিয়েছে। আধুনিক পরিবারের চাহিদা সম অংশীদারিত্ব, যা কিনা পিতৃতান্ত্রিক স্বৈরতান্ত্রিক পরিবারব্যবস্থাকে কম স্থায়ী করে তুলেছে। পরিবার হলো জীবনে প্রয়োজন স্থিতিশীল ভিত্তি, ত্যাগ করার মানসিকতা, ব্যক্তিগত সদয়তা, সামাজিক দায়িত্ব পালন। এবং যেহেতু ক্রমশ এইসব গুণের অবনতি হচ্ছে, বিবাহবিচ্ছেদও ক্রমশই বাড়ছে।

(২) **সামাজিক সংরক্ষণশীলতার হ্রাসমানতা** ঃ পরিবারের স্থিতিহীনতার একটি বড়ো কারণ পরিবারের কার্যাবলির পরিবর্তন। অর্থনীতিক প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক চাপের ফলে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে দম্পতির মধ্যে একে ওপরের সঙ্গে মানিয়ে চলার নিরন্তর চেষ্টা থাকত। আজকে সেই প্রয়োজনীয়তা ও চাপ দুটোই কমে এসেছে। কলকারখানা নির্ভর উৎপাদন পরিবারের অর্থনৈতিক একক হিসাবে চলার ক্ষেত্রকে বাতিল করেছে। ফলে মহিলারাও এখন আয় করেন এবং পুরুষ সঙ্গীটির ওপর আর তারা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নন। সুতরাং যখনই তিনি দেখেন যে তার পছন্দ অনুযায়ী তার পুরুষটি চলছেন না তখনই তিনি তার থেকে আলাদা হওয়ার কথা ভাবতে পারেন। এই সময়ের নগরজীবনে যেহেতু কেউ কারো কথা তেমনভাবে না তাই সমাজও এইসব ক্ষেত্রে মহিলাটির ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি করে না। যেহেতু পরিবার ব্যবস্থা নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে টিকে থাকার জন্য সেহেতু আধুনিক পরিবার, যার সম্পর্কের ভিত্তি তেমন মজবুত নয়, তা খুব সহজেই ভেঙে পড়ে।

পূর্বে অর্থনীতিক কারণে মহিলারা পরিবারের ওপর নির্ভরশীল ছিল যা এখন আর একইভাবে লক্ষ করা যায় না। তা ছাড়া পেশায় বাণিজ্যিকীকরণের ফলে মহিলা, পুরুষ উভয়কেই বস্ত্র, খাদ্য ও আমোদ-প্রমোদের জন্য পরিবারের ওপর নির্ভরশীল করে রাখেনি। শিল্পোন্নত সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যতই মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে ততই পরিবারের স্থিতিহীনতা বাড়বে।

হিন্দু বিবাহ আইনের ১৯৬৫-এর সেকশন ১৩-তে বলা হয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদ চাওয়ার ক্ষেত্রে কী কী প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করা হয়—(i) ব্যভিচার, (ii) নৃশংসতা, (iii) বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা/ছেড়ে চলে যাওয়া, (iv) ধর্ম পরিবর্তন করা, (v) মানসিক রোগ যা চিকিৎসাসাধ্য নয়, (vi) কুষ্ঠরোগ, (vii) যৌনসংক্রমক রোগ, (viii) সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া, (ix) মৃত্যু হতে পারে এমন সম্ভাবনার সৃষ্টি, (x) আইনগতভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার সুপারিশ সত্ত্বেও পৃথকভাবে না থাকা (xi) বিবাহোত্তর অধিকার বলবৎ না করা।

১৯৭৬-এর সংশোধিত বিবাহ আইনে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাই ছিল আইনত বিবাহবিচ্ছেদ পাওয়ার বৈধ পথ। সেকশন ১৩ এবং ১০(১) (ক) দুটিতেই বলা হয় যে বিবাহবিচ্ছেদের আর্জি জানানোর দু-বছর আগে থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেই আইনত বিবাহবিচ্ছেদ হতে পারে।

বিবাহোত্তর বনিবনা না হলেই যেহেতু বিবাহবিচ্ছেদ হয়, তা দূর করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে—

(১) যে-কোনো ধরনের অপমানজনক মানসিকতা দূরে সরাতে হবে।

(২) অপ্রয়োজনীয় উত্তেজক উপাদানকে সরিয়ে দিতে হবে।

(৩) নতুন আনন্দদায়ক জিনিস খুঁজতে হবে।

(৪) পরস্পর বোঝাপড়ার মাধ্যমে শিশুর জন্মদান।

(৫) নিজের জীবনসঙ্গীকে বোঝা।

(৬) নিজের সঙ্গীটির সঙ্গে পরিবারের সমস্যা খোলাখুলি আলোচনা করা কিন্তু অন্তহীন তর্ক না করা।

(৭) পারস্পরিক ভালো লাগার দিকগুলি খুঁজে বের করা এবং একসঙ্গে কোনো পরিকল্পনা তৈরি করা।

(৮) অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু ছেড়ে দেওয়া। নিজের খুশির জন্য সঙ্গীটির চাহিদা বিসর্জন না দেওয়া, যাতে তার মধ্যে কোনো দুঃখের জন্ম না হয় তা দেখা।

(৯) পরিবারের ভালো জিনিসটিকে সবার আগে প্রাধান্য দেওয়া। শুধু নিজের কথা না ভাবা।

২.৩ বাল্যবিবাহ

ভারতে বাল্যবিবাহ প্রায় এমন একটি প্রথা হিসাবে প্রচলিত যে সাধারণ মানুষ এই প্রথাপালন অবশ্য কর্তব্য হিসাবে পালন করে। একটি জনপ্রিয় গবেষণায় দেখা গেছে যে গত ৩৫ বছরে এই রীতি পালনে তেমন কোনো তফাৎ ঘটেনি, বিশেষ করে রাজস্থানের মতো অঞ্চলে যেখানে খুব অল্প বয়সে নারী ও পুরুষ উভয়েরই বিয়ে হয়। এই গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই রীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। যদিও সম্প্রদায়ের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এই সামাজিক অন্যায় প্রতিকারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। বাল্যবিবাহের কুফল প্রচারের মাধ্যমেও এই প্রথাপালনে শিথিলতা আনা যেতে পারে। শিক্ষার প্রসার ও গণমাধ্যমের সাহায্যে সাধারণ মানুষের মনে এই বিষয়ে চেতনা ক্রমশ দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। বাল্যবিবাহের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য নানান স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রচার চালাচ্ছে এবং এই সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজারও চেষ্টা তারা চালাচ্ছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ প্রথা ছিল না। এই সময়ে নানা ধরনের বিবাহব্যবস্থার প্রচলন ছিল। যেমন—গন্ধর্ব বিবাহ (ভালোবাসা বিবাহ), অসুর বিবাহ (জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা) ইত্যাদি। তবে, বাল্যবিবাহ রীতি কোনোভাবেই ওই সময়ে দেখা যায়নি। মনে করা হয় যে মধ্যযুগ থেকে এর উদ্ভব হয়েছে। বৈদিক যুগে বিশেষ করে ঋগ্‌বেদে উল্লেখ আছে যে একটি মেয়ের বিয়ে হতে পারে শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বেড়ে ওঠার পর। এবং তার বাবার বাড়িতে থাকাকালীনই তার শারীরিক বৃদ্ধি হওয়া উচিত। সেখানে উল্লেখ করা আছে যে একটি পুরুষের উচিত সম্পূর্ণভাবে বেড়ে ওঠা মহিলাকেই বিয়ে করা। অন্য একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে একজন নারীর তখন বিয়ে করা উচিত যখন সে তার বাল্যকাল পেরিয়ে এসেছে।

ভারতে ১৮৬০-এর দশকে মনে করা হত যে মেয়েদের ৮ অথবা ৯ বছর বয়সের আগেই বিয়ে দেওয়া উচিত। বাল্যবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে যুগান্তকারী পথ দেখিয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ তাদের

সামাজিক-সংস্কারমূলক ধর্মীয় আন্দোলনের মাধ্যমে। ১৮৬০-এর শেষভাগে কিছু সাফল্য এসেছিল যখন ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে (Indian Penal Code) ১০ বছরের কম বয়সি স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সংযোগ আইনত অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। তবুও ১৮৮০-এর আগে অবধি বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে জনসাধারণের চোখে ধরা পড়েনি। সম্মতি দানের বয়স সংক্রান্ত বিলের মাধ্যমে এই প্রথাটি জনসাধারণের চোখে একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে ধরা দেয়। ১৮৮৬-তে হিন্দু ইনফ্যান্ট ম্যারেজ-এর বিরুদ্ধে পিটিশন দাখিল করা হয়। মিরাটের জনসাধারণের দ্বারা তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার এই আইন প্রণয়ন করেন ১৯২৭ সালে। সেখানে বলা হয় যে-কোনো মেয়ের ১২ বছর বয়স না হওয়া অবধি তার বিবাহ সম্ভব নয়। ১৯২৯ সালে চাইল্ড ম্যারেজ রেস্ট্রেন্ট অ্যাক্ট পাশ হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল বাল্যবিবাহের সঙ্গে সংযুক্ত অনৈতিক দিক যেমন বিবাহিত জীবনের ফলে একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের শরীর ও স্বাস্থ্যের ওপর বা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়ের জীবনে যে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে সে বিষয়ে সচেতন হওয়া।

এই আইনে বলা হয়—

(১) অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বলতে বোঝায় ২১ বছর বয়সের কম এবং মেয়ের ক্ষেত্রে এই বয়সসীমা ১৮ বছরের নীচে।

(২) বাল্যবিবাহ বলতে বোঝায় এমন বিবাহক্ষেত্র যেখানে দম্পতির মধ্যে যে কোনো একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক।

তবে এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে এই দুটি প্রস্তাবমতো কোনো বিবাহ না হলে, এই আইনে তা অবৈধ বলা যায় না। কারণ এই আইন অনুযায়ী এই প্রস্তাবদ্বয়ের মধ্যে বৈধতা বা অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না।

বাল্যবিবাহের ফলে শিশু তার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন—স্বাস্থ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার এবং বিবাহের জন্য সঙ্গী বাছার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অধিকার। বাল্যবিবাহের ফলে স্বাস্থ্যহানি এবং শিক্ষার ক্রমহ্রাসমানতা মহিলাদের সমস্যাকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করেছে। রাষ্ট্রের আইনব্যবস্থা এবং তার মধ্যে শিথিলতা, অস্পষ্টতা, দ্বন্দ্ব, বিয়ের বয়সের ক্ষেত্রে লিঙ্গ অসাম্য, সম্মতিদানের বয়স এবং বিবাহের বৈধতা সমালোচনাযোগ্য সারা দেশব্যাপী এই প্রথার প্রসারের জন্য।

২.৪ পণপ্রথা

একটি মেয়ে যখন বিয়ের পর তার বাবার বাড়ি থেকে তার স্বামীর বাড়ি যায়, তখন যে উপহার দেওয়া হয় তাকে পণ নামক প্রতিষ্ঠান বলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটি একটি মোটা দামের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে যার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে নানান ধরনের হিংসাত্মক ব্যবহার (যখন কন্যাভ্রূণ হত্যা, আত্মহত্যা, বধূনির্যাতন, বধূ হত্যার মতো সব ঘৃণ্য অপরাধ। গ্রাম ও শহরের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে পণপ্রথা একটি সামাজিক সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। বিবাহের নিয়ম যেমন, জাতি অন্তর্বিবাহ, গোত্রবহির্বিবাহ এবং অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহকে ভুলভাবে বিশ্লেষণের ফলে পণপ্রথা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই নিয়মগুলির ফলে বিবাহযোগ্য পাত্রপাত্রী নির্বাচনে নিয়ন্ত্রণ থাকে। এর থেকে বোঝা যায় যে জাতির মধ্যে বিবাহ ও গোত্রের বাইরে বিবাহই কাম্য।

পণপ্রথার প্রচলনের জন্য কোন প্রথাগুলি দায়ী তা এককথায় বলা শক্ত। কিন্তু আমরা একটি সম্ভাব্য তালিকা প্রস্তুত করতে পারি। এর মধ্যে কতগুলি বিবাহের নিয়মকানুন, জাতি, ক্রমোচ্চবিন্যাস, পিতৃতন্ত্র, পিতৃপুরুষ, মহিলাদের হ্রাসমান মর্যাদা, আধুনিক শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ত্রুটিপূর্ণ অহংকার চেতনা, কিছু মানুষের অর্থনীতিক উন্নতি। যেহেতু পণপ্রথা একটি জটিল গতিময় সামাজিক সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে সেহেতু এর দ্রুত সমাধান সূত্র খুঁজে বার করা দরকার। শুধুমাত্র আইন প্রণয়নে এই সমস্যার সমাধান হবে না। আইন ব্যবস্থারও নানান ত্রুটি থাকায় তা অতিক্রম করা সবসময় সম্ভবপর নয়। কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আন্দোলনের মাধ্যমে এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। এই সংগঠনগুলি স্পষ্টভাবে হাতেকলমে দেখাচ্ছে কীভাবে খুন, আত্মহত্যা, অত্যাচার এবং হয়রান করার মতো ঘটনা পণপ্রথার সঙ্গে সংযুক্ত। কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক বয়কটও হয়ে থাকে।

এই অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে যা দরকার তা হল এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা কারন এর ফলে বাস্তবে বহু পরিবার, হাজার হাজার মহিলার জীবন শেষ হয়ে গেছে। সমাধানযোগ্য ও নিবারক সূত্র খোঁজার প্রয়োজন যা দীর্ঘমেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদি দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। দীর্ঘমেয়াদি সমাধানসূত্র হল নতুন ভাবাদর্শের মূল্যবোধের প্রণয়ন যেখানে মহিলাদের এবং তাদের পিতামাতাকে সম্মান করা হবে। দেখানো দরকার যে বিবাহযোগ্য বয়সের ছেলেরা বাজারিদ্রব্য নয়, যে তাদের বাবা-মায়েরা পণের বিনিময়ে তাদের ছেলে বিক্রি করবেন। সমতাবাদী মূল্যবোধই জাতিভিত্তিক (উচ্চ/নীচ) বিবাহের (hypergamy) একমাত্র প্রতিকল্প। অন্তর্জাতিভিত্তিক বিবাহকে ইন্ধন জোগানো উচিত এবং দাবি করে সুবিন্যস্ত বিবাহব্যবস্থা (arranged marriage) উঠে যাওয়া উচিত।

এইসব নিরাবক স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থার মধ্যে যেগুলি আসবে তা হল—পণের কারণে মৃত্যুর বা পীড়নের ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ, যারা পণপ্রথার শিকার তাদের আইনি ও সামাজিক সংরক্ষণ করা। টেলিভিশন, রেডিয়ো, খবরের কাগজে এমন কিছু খবরকে তুলে ধরা যাতে এধরনের অপরাধ সচরাচত ভবিষ্যতে না ঘটে। রাস্তার ধারে নাটকের আয়োজন করে এই ধরনের ঘটনাকে তুলে ধরা দরকার। রাজনৈতিক নেতা, সরকারি আমলা, ব্যবসায়ী, অন্যান্যরা যাতে কোনোভাবে পণ দিতে বা নিতে না পারেন তার দিকে লক্ষ রাখা। এটি একটি আবর্তচক্রে পর্যবসিত হয়েছে। যে মানুষ তার মেয়ের জন্য পণ দেন তিনি তার ছেলের বিয়ের সময় আরও বেশি পণ নিতে আগ্রহী থাকেন এবং এভাবে এই পণপ্রথা চলতেই থাকে। সুতরাং এই সমস্যা সমাধানে ওপরের আলোচিত সূত্রগুলিই একমাত্র উপায় এই অপরাধ থেকে মুক্তির।

১৯৫৬-এর দি হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট মেয়েদের তাদের বাবার সম্পত্তিতে অধিকার প্রদান করেছে ; কিন্তু খুব কম সময়ই মেয়েদের এই অধিকার দেওয়া হয় বা তারা তাদের ভাগ চান। এই আইনটি সম্পূর্ণই একটি আতিশয্যে পরিণত হয়েছে। ১৯৬১-এর দি ডাউরি প্রহিবিশন অ্যাক্ট (The Dowry Prohibition Act of 1961) পণপ্রথার সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ। কোনো মেয়ে বাবা-মা-র সম্পত্তির অধিকার চায় না কারণ তাদের বাবা-মায়েরা তাদের বিয়েতে অনেক টাকা খরচ করেন। ১৯৬১-এর আইনটি পণপ্রথা রোধের জন্য গৃহীত। কিন্তু তবুও পণপ্রথা সর্বব্যাপী। এর আগে পর্যন্ত যেসব সম্প্রদায়, জাতি ও ধর্মে পণপ্রথা ছড়িয়ে পড়েনি, সেখানেও বর্তমানে পণপ্রথার গভীর প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।

২.৫ অনুশীলনী

(১) বর্তমানের ভারতীয় সমাজে পরিবারের নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করুন।

(২) বিবাহবিচ্ছেদ কী ? এর কারণ ও ফলাফল কী কী ?

(৩) পণপ্রথা কী ? এর বিভিন্ন ধরনগুলি কী কী ? ভারতে এর প্রসার কতটা ?

একক ৩ ❑ সামাজিক নির্ভরশীলতার সমস্যা ঃ বার্ধক্য, অক্ষম, গৃহহীন

গঠন

৩.১ বৃদ্ধদের সমস্যা

৩.২ অক্ষমদের সমস্যা

৩.৩ গৃহহীনদের সমস্যা

৩.৪ অনুশীলনী

৩.১ বৃদ্ধদের সমস্যা

ভারতে বিধিবদ্ধভাবে ৫৫ বছর বয়সকেই বার্ধক্য হিসাবে ধরা হতো। যে সময় চাকুরিরতরা তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিতেন। পরবর্তীকালে এই বয়সের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো হয় ৫৮ বছরে। পশ্চিমীদেশগুলিতে, কোনো ব্যক্তিকে বৃদ্ধ বলা হয় যখন তার বয়স হয় ৬০-৬৫ বছর বয়সের মধ্যে। জীবনের গড় বেঁচে থাকার সময়সীমার ওপর নির্ভর করে কাকে বার্ধক্য বলে। জীবনের গড় বেঁচে থাকার সময়সীমায় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সরকারের ওপর ক্রমশ চাপ সৃষ্টি হচ্ছে যাতে বৃদ্ধ বয়সের বিধিবদ্ধ সীমা বৃদ্ধি পায় ৬০ বছরে।

বৃদ্ধ বয়সের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে মিলে যায়। বৃদ্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ সামাজিক বিষয় হিসাবে কখনও কম কখনও বেশি হয়েছে। তবে এই সামাজিক বিষয়টির উপস্থাপনে সবসময়ই একটি দ্বন্দ্ব দেখা গেছে পর্যবেক্ষণকৃত প্রমাণ ও সমস্যা হিসাবে প্রত্যক্ষকরণের মধ্যে। এই দ্বন্দ্বটি থেকেই গেছে কারণ এটি একটি রাষ্ট্র, নাগরিক ও পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্বের একটি প্রত্যক্ষরূপ। বিশেষত এই কারণে যে বৃদ্ধদের প্রয়োজনকে প্রায়ই উপস্থাপিত করা হয়েছে অন্যের ওপর চাপ হিসাবে এবং সে কারণেই এটিকে এমন একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে যার আশু সমাধান দরকার। যাদের কাছে বার্ধক্য একটি সমস্যা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এইরকম :

(i) বৃদ্ধ মানুষদের আয়ু ও তাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা পেনশন ব্যবস্থার ওপর চাপ তৈরি করে বিশেষত বর্তমান কর ব্যবস্থা থেকেই যখন তা মেটানো হয়।

(ii) যেহেতু বৃদ্ধদের মধ্যে যারা অতিবৃদ্ধ যাদের বয়স ৭৫-৮০-এর মধ্যে তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা হল সেবা, যা রাষ্ট্র ও পরিবার অনেক সময়ই মেটাতে পারে না।

(iii) প্রত্যেকটি বৃদ্ধ প্রজন্মে আগের তুলনায় পরিসেবা ও আয়ের চাহিদা বেশি। এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের ওপর এমন একটি চাপ যা তাদের ওই ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার মান, স্বার্থপরতার সঙ্গে খাপ খায় না।

(iv) পরিবার যা আগে বৃদ্ধ মানুষের সেবা করত তা ক্রমশ ভঙ্গুর ও পরিবর্তনশীল হয়ে ওঠায় এই বৃদ্ধদের পক্ষে সেখানে ওই একই সেবা ও সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া পরিবারে কর্তব্যপরায়ণতার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধও এখন অনেক শিথিল হয়ে পড়েছে।

(v) পরিবারের মধ্যে মহিলারই সামাজিক সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। তারা বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করায় তাদের হাতে সেবা করার মতো সময়ের অভাব ঘটছে। আজ খুব কম মহিলাই সেবাই ধর্ম এই নীতি মেনে চলবেন।

নিঃশব্দে একটি বিপ্লব ঘটে গেছে বিগত ১০০ বছরে—যা চোখে দেখা যায়নি, অশ্রুতপূর্ব, তবুও খুব কাছাকাছি। এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হল দীর্ঘ আয়ু। বিশ্ব জুড়ে আয়ুষ্কালের বৃদ্ধি হওয়ায় বৃদ্ধ মানুষের সংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে।

ভারতের অবস্থা ঃ ভারতে গড় আয়ুষ্কালে বৃদ্ধি ঘটেছে হয়েছে ২০ বছর থেকে ৬২ বছরে। উন্নত চিকিৎসা পরিসেবা, নিম্নগামী প্রজনন হার সমাজে বৃদ্ধ জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ফ্রান্সে বৃদ্ধ জনসংখ্যা ৭% থেকে ১৪%-এ পৌঁছাতে ১২০ বছর লেগেছিল সেখানে ভারতে বৃদ্ধ জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে মাত্র ২৫ বছর।

বয়স্ক নাগরিকদের পরিসংখ্যানগত রূপরেখা (২০০১)

- ৭৭ মিলিয়ন বৃদ্ধ জনসংখ্যা।
- ৯০%-এর কোনো সামাজিক নিরাপত্তা নেই।
- ৩০% বৃদ্ধ জনসংখ্যা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন।
- ৩৩% বৃদ্ধ জনসংখ্যা দারিদ্র্যসীমার অল্প ওপরে (প্রান্তিক) বসবাস করেন।
- ৮০% বৃদ্ধ জনসংখ্যা গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেন।
- ৭৩% বৃদ্ধ নিরক্ষর, যারা শুধু কায়িক শ্রম করতে সক্ষম।

- ৫৫% বৃদ্ধারা বিধবা।
- ভারতে প্রায় ২,০০,০০০ জন শতায়ু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছেন।

ভারতীয় সমাজে বৃদ্ধদের জনসংখ্যা সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে, কারন

- আয়ুষ্কালে বৃদ্ধি।
- স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি ও চিকিৎসা পরিসেবায় উন্নতি।
- উন্নত পুষ্টিযুক্ত খাবার।
- মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান।
- নিম্নগামী প্রজনন হার।
- উন্নত সচেতনতা

এই ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধান সমাজে পরিসেবামূলক গোষ্ঠীর হাতে। এই পরিসেবামূলক গোষ্ঠীই ঠিক করবে ফাঁকগুলি কোথায় এবং ভবিষ্যতে পরিসেবা, প্রতিরোধ ও নিপীড়ন কীভাবে মেকাবিলা করা যায়।

১৯০১ থেকে ২০২৫ ; ১২ মিলিয়ন থেকে ১৭৭ মিলিয়ন ঃ

- ১৯০১—আমাদের ছিল ১২ মিলিয়ন বৃদ্ধ জনগোষ্ঠী।
- ১৯৫১—আমাদের ছিল ১৯ মিলিয়ন বৃদ্ধ জনগোষ্ঠী।
- ২০০১—আমাদের ছিল ৭৭ মিলিয়ন বৃদ্ধ জনগোষ্ঠী।
- ২০২৫—আমাদের ১৭৭ মিলিয়ন বৃদ্ধ জনগোষ্ঠী হতে পারে।

মূল বিপদসংকেত

অনেক সময় বৃদ্ধ বয়সের সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারা, মানসিক চাপ, একাকীত্ব, কিছু মাত্রায় বিচ্ছিন্নতা পারিবার জীবন থেকে এগুলি সংযুক্ত হয়ে পড়ে। এই সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে জীবনযাত্রার পরিবর্তন, মানসিকতা, মূল্যবোধ ও প্রজন্মান্তরের ফারাক।

সমস্যার মূল বিষয়সমুহ

- সম্মানপ্রাপ্তি।
- স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিসেবার সুযোগপ্রাপ্তি।
- অর্থনৈতিক ও শারীরিক নিরাপত্তাহীনতা।

- বৃদ্ধদের নিপীড়ন।
- হিংসা।
- জীবনের গুণগতমান।
- গ্রহণ না করা।
- অস্বীকার করা।
- অবসাদ।
- একাকীত্ব।
- পরিবার জীবন থেকে কিছু মাত্রায় বিচ্ছিন্নতা।

বৃদ্ধদের জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকর্মের খসড়া

রাষ্ট্রপুঞ্জের বিজ্ঞানসম্মত অনুমান অনুযায়ী ২০২৫-এ ১.২ বিলিয়ন বৃদ্ধ বিশ্বে বাস করবেন। তাদের মধ্যে ৭১% উন্নয়নশীল দেশে বসবাস করবেন। এবং ১৯৫০-২০২৫-এর মধ্যে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অতিবৃদ্ধদের (৮০ বছরের বেশি যাদের বয়স) সংখ্যা ৬০ + বৃদ্ধদের সংখ্যার দ্বিগুণ বেশি হারে বৃদ্ধি পাবে। সাধারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় দ্বিগুণ হারে ৬০ + জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ হল আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, জন্মহারের হ্রাসমানতা এবং স্বাস্থ্য পরিসেবার উন্নতি ইত্যাদি।

আমাদের দেশের গড় আয়ুষ্কাল এই শতাব্দীর শুরুতে যা ছিল ২৩ বছর তা ১৯৫১-তে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ এবং তার তিনদশক পরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮ বছর বয়সে। আশা করা যায় যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তা ৬০ ছাড়িয়ে যাবে। আমাদের দেশে বৃদ্ধ মানুষের জনসংখ্যা যা ১৯৮১-তে ছিল ৪৩ মিলিয়ন তা ইতিমধ্যেই ৫০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে এবং আশা করা যায় যে পরবর্তীতে তা ৭৫ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে।

গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব আয়ুষ্কালে বৃদ্ধি। এটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে বোঝানো যায় ঃ

১৯০১ সালে ছিল ১২ মিলিয়ন বৃদ্ধ মানুষ

১৯৫১ সালে ছিল ১৯ মিলিয়ন

১৯৯৯ সালে ছিল ৭০ মিলিয়ন

২০২৫-এর মধ্যে ১৭৭ মিলিয়ন বৃদ্ধ মানুষ বসবাস করবে।

একদিকে যেমন সংখ্যার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হয়েছে তেমনি অন্যদিকে জীবনচর্চার গুণমান ক্রমহ্রাসমান। শিল্পায়ন, প্রব্রজন, নগরায়ন এবং পশ্চিমিকরণের ফলে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটছে। পূর্বতন যৌথ পরিবার, যা ছিল প্রকৃতিগতভাবে সহকারী ব্যবস্থা তা ভেঙে পড়ছে। বর্তমানের দ্রুত জীবনযাত্রা সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

WHO-এর কার্যপ্রক্রিয়ার একটি উদাহরণ

নতুন যে কার্যপ্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে বৃদ্ধদের জন্য তার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেসব বৃদ্ধদের অসুস্থতা আছে তাদের ওপর জোর দিতে গিয়ে সেইসব দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নশীল প্রক্রিয়া যার জন্য এই ধরনের অসুস্থতা হয়েছে, তা খেয়াল রাখা হয়নি। এজন্য ১৯৯৫-এর জানুয়ারিতে ৯৫-তম কার্যনির্বাহী বোর্ড-এর সেশনে এই HEE প্রক্রিয়াটিকে পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও বার্ধক্য এই দুয়ের ক্ষেত্রেই জোর দেওয়া হয়েছে বেশি বয়স ও বার্ধক্য প্রক্রিয়ার ওপর, বিশেষত বিশ্বজুড়ে বার্ধক্য প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জগুলিকে মাথায় রেখে।

১৯৯৮-এ WHO-এর এক্সপার্ট কমিটি এর ওপর বিবেচনা করে। ১৯৯৯ সালকে বৃদ্ধদের বছর হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং WHO এর পক্ষ থেকে তার সদস্য দেশগুলিকে বৃদ্ধদের স্বাস্থ্যের উন্নয়নে বড়ো ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১. জীবনচক্রের দৃষ্টিভঙ্গি ঃ জীবনচক্রের সমস্ত অংশে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধানতা বৃদ্ধ বয়সের স্বাস্থ্য অবস্থাকে নির্দেশ করে। অল্প বয়স থেকে জীবনযাত্রার ধরণ স্বাস্থ্যকে নির্ধারণ করে যা খুব সহজে পরিবর্তন করা যায় না। তা ছাড়া বৃদ্ধ বয়সে যে রোগ সবচেয়ে বেশি হয় তা হল হৃদ্‌রোগ ও ক্যানসার যা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার ফলে ঘটে।

২. কোহর্ট দৃষ্টিভঙ্গি ঃ দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনকে বুঝতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বার্ধক্যের ওপর গবেষণা জরুরি। জীবনচক্রের অন্যান্য পর্বের তুলনায় খুব কমই বার্ধক্য সম্বন্ধে জানা যায়। এর কারণ গবেষণায় স্বাস্থ্য কীভাবে গঠিত হয় এবং কোন উপাদানগুলি তাকে রক্ষা ও ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা জানা হয় না।

৩. স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে দৃষ্টিভঙ্গি ঃ বিশ্ব বার্ধক্য অবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অকার্যকরী কোনো প্রক্রিয়া সক্ষম নয়। পরিসংখ্যানগত ক্ষেত্রে বয়স ও রোগ সম্বন্ধে, বয়সকে সমস্যা হিসাবে দেখানো হয়। এর ফলে মনে কার হয় যে বয়স বেড়ে চলা মানেই তা সমস্যার জন্ম দেবে। এই ধরনের

নঞার্থক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবকারী স্বাস্থ্য পরিসেবা ও নীতিকে প্রভাবিত করবে। আড়াআড়ি গবেষণায় দেখা গেছে যে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে বৃদ্ধদের মধ্যে। এর থেকে এমন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে যাতে বৃদ্ধরা স্বাস্থ্যবান থাকেন ও ব্যক্তিগত এবং বহিরাগত সম্পদ আহরণে সক্ষম থাকেন।

৪. **সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ** একটি কার্যকরী জীবনচক্র দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় প্রোথিত হওয়া উচিত সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। প্রতিদিনের জীবনের প্রক্রিয়াগুলি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই শেখা হয় যা জীবনের লক্ষ্য ও মূল্যবোধকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সমবয়সিদের চাপ, সনাতনী ঐতিহ্যের সঙ্গে সমাজের আত্মিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, সাহায্যের অভ্যাস, ছোটোদের ও পরিবারের কর্তব্য হল বিশেষ কিছু প্রভাব সৃষ্টি করা যা জীবনকে গড়তে ও অতিবাহিত করতে সাহায্য করে। এগুলির পরিষ্কার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে এবং এগুলির উন্নতিতে বৃদ্ধ বয়সে ভালো থাকা সম্পর্কেও পরিকল্পনা করা যায়।

৫. **লিঙ্গাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ** স্বাস্থ্য পরিসেবা ও গবেষণাকে কার্যকরী হতে হলে লিঙ্গাভিত্তিক স্বাস্থ্যভেদ সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। সাধারণত পুরুষদের মৃত্যু আগে হয় আবার মহিলারা রোগের ও অক্ষমতার শিকার বেশি হয়। মহিলারাই বেশিরভাগ পরিসেবা দিয়ে থাকেন এবং তাদের সাহায্য করাই স্বাস্থ্যনীতির সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

৬. **আন্তঃপ্রজন্মভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ** যারা বৃদ্ধ হয়েছেন এবং যারা বৃদ্ধ হতে চলেছেন, দুজনের কাছেই বার্ধক্য জরুরি। বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর একটি প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তন হল আন্তঃপ্রজন্মের সম্পর্কের পুনর্গঠন করা। যদি বৃদ্ধদের জন্য নতুন কোনো ভূমিকার উদ্ভাবন করতে হয় তাহলে আন্তঃপ্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছু নীতি নির্ধারণ প্রয়োজন। যদি দুই প্রজন্মের মধ্যে বিরোধ কমিয়ে ঐক্য আনতে হয় তাহলেও কিছু নীতি নির্ধারণ দরকার।

৭. **নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি ঃ** যখন একটি জনসম্প্রদায়ের বয়স বাড়তে থাকে তখন একঝাঁক নীতি সামনে চলে আসে। এগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হল অনৈক্য, সম্পদের বণ্টন, মধ্যস্থতা সম্পর্কে নীতি, মৃত্যু সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় ঢিলেমি বা তাড়াহুড়ো এবং দীর্ঘমেয়াদ সাহায্যকারী ব্যবস্থা যাতে দরিদ্রের, অক্ষম বৃদ্ধের মানবাধিকার রক্ষিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা তার সদস্য দেশগুলিকে এই জটিল সমস্যা মোকাবিলা করতে আহ্বান জানিয়েছে সব বৃদ্ধ মানুষদের অধিকার তুলে ধরা ও প্রচারের মাধ্যমে।

৮. **মূল কার্যক্রমের উপাদান ঃ** AHE বর্তমানে একটি প্রণালীবদ্ধ বিশ্ব স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য ব্যবস্থার

প্রচেষ্টা করছে। যাতে ১৯৮৭ সালে এক্সপার্ট কমিটির দ্বারা মনোনীত নির্দেশগুলি পালন করা হবে। এই কমিটি অনুমোদিত উপাদানগুলি হল—তথ্যের প্রচার সমর্থন করা, গবেষণার বিষয়বস্তু জানিয়ে গবেষণা চালানো, অনুশীলন, নীতি নির্ধারণ। এই উপাদানগুলি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং অনেক সময়ই একে অপরের ওপর আবৃত।

৯. তথ্যের ভিত্তি শক্তিশালী করা ঃ গত কয়েক দশক ধরে বার্ধক্যজনিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে যার মধ্যে বার্ধক্যের স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য বিশেষভাবে যোগ করা হচ্ছে। বিচার-বিবেচনাকারীদের, প্রশাসকগণদের এবং পরিসেবা দানকারীদের, পেশাদারদের প্রয়োজন সবসময় যেসব নীতি নির্ধারণ করা হচ্ছে তার সম্পর্কে খবর রাখা। এমনকি স্বাস্থ্য বিষয়ক যেসব গবেষণা চলছে তারও খবর রাখা। AHE বর্তমানে কিছু তথ্যকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করছে যেখানে বার্ধক্যের গতিপ্রকৃতি, স্বাস্থ্য এবং যেসব গবেষণা বা নিরীক্ষা চলছে তার খবর এবং পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশে পরিসেবার মূলকেন্দ্রটি কী ঘিরে সে সম্বন্ধে তথ্য থাকবে। ইলেকট্রনিকস যোগাযোগের মাধ্যমে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থা এই তথ্যকে সংগঠিত করবে।

কার্যধারার উদাহরণ ঃ আন্তর্দেশীয় একটি গবেষণায় ৩৫টি সম্প্রদায়কে ভিত্তি করে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বৃদ্ধ মানুষদের গৃহভিত্তিক পরিসেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং (NIA)-এর আর্থিক সহযোগিতায় AHE-র কর্মচারীরা এই গবেষণা চালান। NIA, AHE-কে বিশ্বজুড়ে যে তথ্য সংগ্রহ হয়েছে তা একত্রিত করতেও সাহায্য করছে। এই তথ্যে জানা যাবে একবিংশ শতাব্দীতে কীভাবে রোগের প্রকোপ বার্ধক্যের ওপর চেপে বসে।

স্বাস্থ্যকর বার্ধক্যের ওপর একটি ইলেকট্রনিকস লাইব্রেরি আছে যেখানে ওই বিষয়ে গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধেও জানা যায়। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সহযোগে এই লাইব্রেরিটি পরিচালিত হয়। একটি ডাকযোগে সমীক্ষার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণের ভিত্তিগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। AHE একটি লিঙ্গভিত্তিক তথ্যভাণ্ডারও তৈরি করছে যেখানে বিভিন্ন সমাজের পুরুষ ও মহিলার বার্ধক্য প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নানা তথ্য থাকবে।

১০. তথ্যের প্রচার ঃ বার্ধক্যের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তথ্য কতগুলি কাঠামো বৃদ্ধদের মধ্যে, পরিসেবাদানকারীদের মধ্যে, পেশাদারদের মধ্যে, নীতি নির্ধারকদের মধ্যে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছড়িয়ে

দিতে হবে। AHE-এ বিষয়ে কতগুলি রীতিবদ্ধতা মেনে এই প্রচার করছে যা ছাড়া এই প্রচার কখনোই সম্ভব নয়।

কার্যধারার উদাহরণ ঃ যারা স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য বিষয়ে তথ্য পেলে সবচেয়ে উপকৃত হবেন তাদের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতা ও তথ্য ছড়িয়ে দিতে হবে। কতগুলি বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষালয় ও বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার সাহায্যকারী কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে AHE কতগুলি স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য সম্বন্ধে নির্দেশিকা গ্রহণ করেছে।

এই নির্দেশিকায় শারীরিক কার্যপ্রক্রিয়া, স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া, পিঠের ব্যথা কমানো ও নিয়ন্ত্রণ এবং মলমূত্রাদির বেগ ধারণে অক্ষম যারা তাদের এ বিষয়ে পরামর্শ জানানো হয়েছে।

পরিসেবাদানকারীদের কাজ হল এইসব মানুষের জীবনের গুণগত উন্নতিসাধন। সেজন্য AHE স্কুল অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক, ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অফ সাও পাওলো, ব্রাজিলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই পরিসেবাদানকারীদের জন্য বৃদ্ধদের পরিবারের মধ্যে কীভাবে সাহায্য করা যায় সে বিষয়ে নির্দেশিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সংস্কৃতিই ঠিক করে একজন ব্যক্তি কীভাবে বার্ধক্যের দিকে এগোবে বা বার্ধক্যকে গ্রহণ করবে। বিশ্বজুড়ে বৃদ্ধ জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে মাথায় রেখে AHE কতগুলি পজিশন পেপার সংগঠিত করেছে। এই পত্রগুলি বিশেষজ্ঞরা প্রস্তুত করেছেন তাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত অভিজ্ঞতা থেকে। AHE এমন কিছু দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে যাতে এই নির্দেশিকা সহজভাবে বোঝা সম্ভব হয়। ওয়ার্ল্ড হেলথ ম্যাগাজিন (জুলাই-আগস্ট, ১৯৯৭)-এর বিশেষ সংখ্যায় "অ্যাকটিভ অ্যাজিট" সংক্রান্ত আলোচনা এইরকম একটি পদক্ষেপের উদাহরণ বহন করে।

AHE-এর মূল ভাবনা—যেমন লিঙ্গ বিষয়ক আলোচনা, শারীরিক ক্রিয়াকলাপ, আন্তঃপ্রজন্মভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি—এই ধরনের নিয়মিত পরিবর্তন প্রয়োজন। দি অ্যাজিং অ্যান্ড হেলথ প্রোগ্রাম ধারাবাহিকভাবে গবেষণাপত্রের জন্য যে বিষয়গুলি মনোনীত করেছে সেগুলি হল—মহিলা বার্ধক্য ও স্বাস্থ্য, বৃদ্ধ মহিলাদের হৃদ্‌রোগ, বার্ধক্যে লিঙ্গপ্রভেদ, বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক ক্রিয়াকলাপ, স্বাস্থ্যকর বার্ধক্যে নীতি নির্ধারকদের তথ্য প্রদান প্রমুখ। The WHO Health Cities Movement বার্ধক্য বিষয়ে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করেছে—যার আরও ব্যাপক প্রসার দরকার। AHE এই ধরনের অভিজ্ঞতা ধরে রাখার ওপর একটি নিরীক্ষা চালায় যা পরবর্তীতে Journal of Cross-cultural Gerontology-তে প্রকাশিত হয়।

১১. সমর্থন করা

অনেক দেশে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে বার্ধক্য যে একটি সমস্যা সে বিষয়ে সীমিত ধারণা আছে। এ ছাড়াও অন্যান্যরা মনে করে বার্ধক্যের সঙ্গে বহু অসমাধানযোগ্য সমস্যা আছে। সর্বোপরি, বৃদ্ধ মানুষদের পরিবারের প্রতি, সম্প্রদায়ের প্রতি এবং অর্থনীতির প্রতি যে বিরাট অবদান আছে তা তেমন মূল্য দেওয়া হয় না। সুতরাং সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা দুটি অংশে আছে ঃ

● AHE সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং গণমাধ্যমের উচিত জনমতকে এ বিষয়ে প্রভাবিত করা।

● AHE চেষ্টা করছে যাতে বৃদ্ধ মানুষরা নিজেরাই তাদের সম্বন্ধে নীতি গ্রহণ করতে পারে আঞ্চলিক, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে।

কার্যধারার উদাহরণ ঃ জেনিভায় অনেকগুলি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে। এ ছাড়াও একটি বড়ো অংশের জেরেন্টোলজিক্যাল রিসার্চ কমিউনিটি আছে। এই বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে খুব কমই সংযোগ ছিল। AHE, Swiss National Research Programme on Ageing এবং American Association of Retired Persons-এর স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৯৬-তে Geneva International Network on Ageing (GINA) গঠিত হয়েছে। GINA বর্তমানে স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য বিষয়ে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলছে (যেমন International Day of Older Persons যাপন করা ইত্যাদি) যার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াও লক্ষণীয়। অন্যান্য প্রধান শহরগুলিতেও GINA-র কার্যধারার প্রতিরূপ গড়ে তোলা হচ্ছে।

অন্যান্য কার্যধারার পাশাপাশি, AHE আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে যেখানে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম AHE-তে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এইভাবে AHE-র বক্তব্য আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মাধ্যমে কিছু কিছু বিশেষ দেশে পৌঁছে যাচ্ছে। এভাবে AHE নিজস্ব কর্মধারা প্রতিষ্ঠা করছে এবং স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক সহায়তায় একটি রীতিবদ্ধ নীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারছে। ১৯৯৯ ছিল আন্তর্জাতিক বৃদ্ধবর্ষ। AHE অনেকগুলি কার্যধারার পরিকল্পনা করছে যেখানে বৃদ্ধ জনসংখ্যার স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। AHE বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কেন্দ্রীয় ছাড়পত্র পাওয়া সংস্থা যা রাষ্ট্রপুঞ্জ, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং বিভিন্ন সরকারের সঙ্গে একযোগে বৃদ্ধদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ১৯৯৯ জুড়ে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এই সঙ্গে এও

ঘোষণা করা হয়েছে যে ৭ এপ্রিল ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে উদ্‌যাপন করার পাশাপাশি ওই বছর হেলদি অ্যাজিং ও উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১৯৯৩ থেকে গৃহীত বার্তা ১৯৯৯-এর ১ অক্টোবর "অ্যাকটিভ অ্যাজিং" ধারণাটির মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপন করা গেছে। এর জন্য ১৯৯৭ থেকে জেনিভা ও রিও দি জেনেরি এবং অন্যান্য শহরে অনেক প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল।

১২. গবেষণার বিষয়বস্তু জানিয়ে গবেষণা চালানো

AHE-এর মূল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার গবেষণা রোগ সংক্রান্ত গবেষণাপদ্ধতি আলোচনা থেকে সরে এসে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনাতে সীমাবদ্ধ হয়েছে। এর জন্য পূর্ববর্তী তিনটি কার্যধারার উপাদান জরুরি। এ সম্ভব শুধুমাত্র যদি তথ্যের ভিত্তিকে আরও জোরদার করা যায় এবং তথ্যের সম্প্রচারের মাধ্যমে জ্ঞানের মধ্যে ফাঁকগুলিকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়। এবং সমর্থনের মাধ্যমে, নতুন ভোক্তাদের উৎসাহিত করে এই কাজ সম্ভবপর করে তোলা যায়। বিশেষত তিনটি ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়ার দরকার আছে—

(ক) মহামারী সংক্রান্ত বিদ্যার পরিবর্তনের ধারার আলোচনা করে।

(খ) জনসংখ্যার বার্ধক্যের কাঠামো আলোচনা ও আড়াআড়ি গবেষণার ফলাফল আলোচনা করা।

(গ) স্বাস্থ্যকর বার্ধক্যের নির্ণায়কগুলি চিহ্নিত করা।

AHE বহু বিষয়ক গবেষণাকে উৎসাহিত করে এবং বিভিন্ন দেশের পরিকাঠামোর উন্নতিসাধনের চেষ্টা করে। AHE-এও মনে করে যে বার্ধক্য সম্বন্ধীয় গবেষণার বিষয়ে নতুনত্ব আনা দরকার যাতে বিশ্বের বৃদ্ধ জনসংখ্যার জনস্বাস্থ্য বিষয়ে একটি জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তোলা যায়।

এও মনে করা হচ্ছে যে, ২০০০ সালের প্রথমদিক থেকে AHE নতুন গবেষণা বিষয়ের সূচনা করতে চলেছে। এর জন্য প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে বেলাগাজিও-তে দি রকফেলার ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায়।

কার্যধারার উদাহরণ ঃ পর্যালোচনার ওপর নির্ভর করে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে কতগুলি কর্মশালার আয়োজন হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে নানা বিষয়ের ওপর যার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে বার্ধক্য বিষয়টি। এই বিষয়গুলির প্রচার হয়েছে এবং এর ওপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণও আহ্বান করা হচ্ছে। AHE ডেলফির স্টাইলের অনুরূপভাবে নিরীক্ষা চালাচ্ছে যাতে বার্ধক্যে স্বাস্থ্য বিষয়কে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে।

১৩. প্রশিক্ষণ ঃ

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে বার্ধক্যের গতি ও প্রেক্ষিত থেকে বলা যায় যে আগামী দুই তিন দশকের মধ্যে ১.২ বিলিয়ন বৃদ্ধকে পরিসেবা দিতে সক্ষম হবে যে-কোনো দেশ। সেজন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। AHE সমস্ত সমাজকর্মী ও পেশাদারদের স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণের মূল ভিত্তি হিসাবে বার্ধক্য বিষয়কে প্রাধান্য দিচ্ছে। তাছাড়া AHE বার্ধক্যের মহামারিবিদ্যা সম্বন্ধেও স্বাস্থ্য ও বার্ধক্য বিষয়ক পেশাদারদের মধ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে।

কার্যধারার উদাহরণ ঃ AHE, সুইজারল্যান্ড, ট্যুইনিশিয়া এবং মেক্সিকোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মীদের বৃদ্ধদের সেবা বিষয়ে, প্রশিক্ষণের খসড়া তৈরি করা হচ্ছে। বৃদ্ধদের অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক কয়েকটি নির্দেশক নিয়ে এই খসড়া তৈরি হয়েছে। প্রত্যেক দেশে যাতে বার্ধক্যের মহামারিবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা শুরু হয় সে বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে কতগুলি স্বল্পমেয়াদি কোর্স চালু করেছে AHE লন্ডন ইউনিভার্সিটির পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে। ১৯৯৭-এ এই ধরনের প্রথম স্বল্পমেয়াদি কোর্স হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়।

ইউনিভার্সিটি অফ জেনিভার সঙ্গে সহযোগিতায় AHE শারীরচর্চার শিক্ষকদের জন্য বৃদ্ধ বয়সের শারীরিক কার্যকলাপ প্রসঙ্গে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে।

১৪. নীতি প্রণয়ন ঃ

বার্ধক্য ও স্বাস্থ্য শিবিরের প্রথম লক্ষ্য হল সদস্য রাষ্ট্রের কাজকর্মে বৃদ্ধ জনসম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে বিশেষ নীতি প্রণয়নে সাহায্য করা। পূর্বের সমস্ত শিবিরও এই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছে।

AHE ধীরে ধীরে সহযোগী দেশগুলির বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বৃদ্ধ জনসম্প্রদায়ের জন্য স্বাস্থ্য নীতি গঠনে উদ্যোগী হয়েছে। বার্ধক্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত কমিটিরও লক্ষ্য এ বিষয়ে উপায় ঠিক করা। ১৯৯৯ থেকে শুরু করে দেশভিত্তিক আন্তঃক্ষেত্র বিশেষে কর্মশালার আয়োজন করছে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার আঞ্চলিক শাখাগুলি যাতে স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য নীতি গঠন করা যায়। এই কর্মশালায় নীতি প্রণয়নের জন্য পুস্তিকা প্রকাশ যেখানে যেখানে সম্ভব করা হয়েছে আগে থেকে পাওয়া জাতীয় নিরীক্ষা পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে।

কার্যধারার উদাহরণ ঃ জুলাই ১৯৯৬-এ ব্রাজিলীয় সরকারের সহায়তায় AHE আন্তর্জাতিক

আলোচনা সভার আয়োজন করে যার উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য প্রক্রিয়া বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করা। ১৯৯৭-এ AHE বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার সহায়ক কেন্দ্রের সহায়তায় "অ্যাজিং, হেলথ অ্যান্ড দি হোম এনভাইরনমেন্ট" এর ওপর আলোচনার আয়োজন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল এই আলোচনা প্রসূত বক্তব্যের সাহায্যে প্রত্যেক দেশের জন্য উপযোগী নীতি গঠন করা যাতে বৃদ্ধরা তাদের স্বাধিকার বজায় রাখতে পারে।

১৯৯৭-এ জার্মান মিনিস্ট্রি অফ হেলথ-এর সহযোগিতায় হ্যানোভার, জার্মানিতে AHE একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। এই আলোচনার বিষয় ছিল "পপুলেশন অ্যাজিং হেলথ কেয়ার কস্ট অ্যান্ড পলিসি ডেভেলপমেন্ট"-এর উদ্দেশ্য হল বৃদ্ধ বয়সের স্বাস্থ্য বিষয়ে নীতি নির্ধারকদের তথ্যভিত্তি তৈরি করা।

AHE চেষ্টা করছে বিশ্বকেন্দ্র গঠন করা যেখানে বার্ধক্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়নকল্পে উন্নয়নশীল দেশগুলির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হবে। এর প্রথমকেন্দ্র গঠনের জন্য ব্রাজিলের সাও পাওলোতে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যাপিনোসের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ছক ঃ

An Integrated Programme for Older Persons

লক্ষ্যসমূহ ঃ এই প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য হল সমস্ত বয়সের জন্য উপযোগী সমাজ গঠন করা যেখানে বৃদ্ধ মানুষদের জীবনের গুণমান উন্নত করা হবে এবং তাদের ক্ষমতায়িত করা হবে। এর উদ্দেশ্য হল সরকারি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সচেতনতা গড়ে তোলা যাতে এই বৃদ্ধ মানুষদের তাদের প্রয়োজনে কিছু উপযোগী কাজে ব্যবহার করা যায়। এই স্কিমে ১৮৬টি বৃদ্ধাবাস, ২২৩টি ডে কেয়ার সেন্টার, ২৮টি মেডিকেয়ার ইউনিট এবং কিছু প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলিই ৪০০টি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্যে চালু হয়ে গেছে।

● **অন্নপূর্ণা প্রকল্প ঃ** গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক এই প্রকল্পটি চালু করে ২০০০-২০০১-এ। এই প্রকল্পে ৬৫ বছর বয়সের ওপরে বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের, যারা ন্যাশনাল ওল্ড অ্যাজ পেনশন স্কিমে পেনশন পাচ্ছেন না তারা পেনশন পাবেন। এই প্রকল্পে প্রতি মাসে ১০ কেজি খাদ্যশস্য পাবেন।

২০০২-২০০৩ থেকে এই প্রকল্পটিকে রাজ্য সরকারের কাছে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে ন্যাশনাল সোশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম যার মধ্যে ন্যাশনাল বেনিফিট স্কিম উভয়ই

সংযুক্ত। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ঠিক করবে কীভাবে প্রকল্পটি রূপায়িত করা যায়। অর্থাৎ এই প্রকল্পের রূপায়ণ নির্ভর করে রাজ্য সরকারের ওপর।

● **পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ/ঐচ্ছিক সংগঠন।**

বৃদ্ধাবাস গড়ে তোলার জন্য স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠী/বৃদ্ধমানুষদের জন্য বহুবিধ পরিসেবা কেন্দ্রে সাহায্যার্থে প্রকল্প ঃ

লক্ষ্য

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল বৃদ্ধাবাস গড়ে তোলা ও বৃদ্ধ মানুষদের জন্য বহুবিধ পরিসেবা প্রদানের জন্য ঐচ্ছিক সংগঠন। স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া।

● **জরুরিভিত্তিতে খাদ্যগ্রহণ প্রকল্প ঃ**

অশক্ত, বৃদ্ধ ও প্রান্তিক ব্যক্তি যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে তাদের জন্য সংকটাপন্ন অবস্থায় খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয় এই প্রকল্পের মাধ্যমে। এটি শুরু হয় ২০০১ সালের মে মাস থেকে। এই প্রকল্পটি ওড়িশার রাজ্য সরকার আটটি বিশেষ অনুন্নত জেলায় চালু করেছে। যেমন—বোলাঙ্গির, কালাহান্ডি, কোরাপুট, মালকানগিরি, নাওয়ারঙ্গাপুর, নৌপদা, রায়াগাডা এবং সোনপুর। এসব এলাকায় প্রায় ২ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্টের স্বীকৃতি পেয়ে খাদ্যশস্য (চাল) দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের জন্য যে দাম সেই দামে সরবরাহ করে। ১৪,৪০০.০০ মে. টন চাল ২ লক্ষ উপকৃতকে ৬ টাকা করে প্রতি মাসে দিয়ে থাকে।

৩.২ অক্ষমদের সমস্যা

কোনো ব্যক্তির পা/হাত বা কোনো অঙ্গ আকস্মিকতায় বা প্রকৃতিগত কারণে বিকল হয়ে গেলে, তাকে অক্ষম বলা যায়। এদের জন্য কল্যাণমূলক কাজের আয়োজন করা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ এবং তা পূরণ করা যায় তখনই যখন প্রত্যেকটি নাগরিক, ঐচ্ছিক সংগঠন ও সরকার একসঙ্গে সে বিষয়ে সচেতন হবেন যে এটি তাদের যৌথ দায়িত্ব।

যে-কোনো শিল্পোদ্যোগ বা কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির এটি একটি প্রাথমিক কর্তব্য যে তারা তাদের বিপুল অর্থভাণ্ডারকে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে ব্যবহার করতে পারেন যা বিকলাঙ্গ মানুষদের ঐক্যবদ্ধ

কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে। ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ দ্বারা ঘোষিত "Rights of the Disabled"-এ পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল যে, "অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার প্রত্যেক স্তরে অক্ষমদের প্রয়োজন নিয়ে ভাবতে হবে কারণ এ তাদের অধিকার।" ১৯৮১ সালকে রাষ্ট্রপুঞ্জ আন্তর্জাতিক অক্ষমদের বর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করে। প্রতি বছরের মার্চ মাসের তৃতীয় রবিবারকে 'ওয়ার্ল্ড ডিসএবেল্ড ডে' হিসাবে পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল বিকলাঙ্গদের প্রয়োজনগুলি কী কী ও তাদের সমস্যাগুলি কোথায় সে বিষয়ে সাধারণ মানুষ যেন সচেতন হয়।

যে-কোনো সুস্থ মানুষের মতোই বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা সমাজের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। আমাদের দেখতে হবে যে তাদের যেন প্রতিস্থাপনের পথ থাকে ও উন্নতি হয়। এটি আমাদের নৈতিক কর্তব্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে বিকলাঙ্গ মানুষের মধ্যে জীবনের প্রতি উচ্ছ্বাস ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকে। শুধুমাত্র তাদের দরকার একটা সুযোগের, যার মাধ্যমে তারা প্রমাণ করতে পারবে যে তারাও যে-কোনো মানুষের মতো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। একটু সাহায্য পেলেই এই অক্ষম মানুষেরা তাদের দুর্ভাগ্যকে জয় করতে পারে। তাদের দক্ষতা ও ক্ষমতার সাহায্যে তারা জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ইন্ধন যোগান দিতে পারে। সুতরাং তাদের ভরসা প্রদান করলেই তারা সমাজের মূল ধারায় যোগদান করতে পারবে।

সমাজকল্যাণমন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত একটি ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভেতে দেখা গেছে যে ১.৮% ভারতীয়র মধ্যে কোনো-না-কোনো অক্ষমতা আছে। ১০%-এর বেশি অক্ষম মানুষদের একের বেশি ক্ষেত্রে অক্ষমতা আছে। প্রত্যেক অক্ষমতাকে আলাদাভাবে দেখলেও শারীরিক অক্ষমতা আছে এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা ৫.৪৩ মিলিয়ন, দৃষ্টির অক্ষমতা আছে এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা ৩.৪৭ মিলিয়ন, শ্রবণশক্তির অক্ষমতা আছে এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা ৩.০২ মিলিয়ন এবং কথা বলার অক্ষমতা আছে এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা ১.৭০ মিলিয়ন। এই গবেষণায় অন্ধ, বিকলাঙ্গ এবং মূক ব্যক্তিদেরই নেওয়া হয়েছে। মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে এমন বা অন্যান্য বিকলাঙ্গ যারা তাদের এই সমীক্ষায় বাদ রাখা হয়েছে।

যারা বংশানুক্রমিকভাবেই অক্ষম তাদের ক্ষেত্রে এই গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রায় ৫% দৃষ্টিহীন গ্রামীণ এলাকায় এবং প্রায় ৮% দৃষ্টিহীন শহর এলাকায় আছে। শ্রবণশক্তিহীন এমন বংশানুক্রমিক অক্ষমদের ক্ষেত্রে ৩০% গ্রামীণ এলাকায় এবং ২৮% শহর এলাকায় পাওয়া গেছে। কথা বলার ক্ষেত্রে যারা অক্ষম তাদের বংশানুক্রমিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে ১৭% গ্রামীণ এলাকায় এবং ৬৭% শহর এলাকায় থাকেন।

বংশানুক্রমিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে মহিলাদের মধ্যে এর অনুপাত পুরুষের তুলনায় কম, মূকদের বাদ দিয়ে। বয়সের সঙ্গে এর ব্যাপকতার হার বৃদ্ধি পায়। মূকদের বাদ দিলে ৬০ বছরের বেশি বয়সিদের মধ্যেই এর ব্যাপকতা বেশি। মূকদের ব্যাপকতা লক্ষ করা যায় ৫-১৪ বছর বয়সিদের মধ্যে। যেসব মানুষের লোকোমোটর অক্ষমতা আছে (১ লক্ষ জনসংখ্যার ক্ষেত্রে) তাদের মধ্যে ৮২৮ জন থাকে গ্রামীণ এলাকায় এবং ৬৭ জন থাকে শহর এলাকায়। যাদের হাত বিকল বা প্যারালাইসিস হয়েছে বা হাত/পায়ের সন্ধিস্থলে কোনো অক্ষমতা আছে, বা যাদের নকল হাত/পা লাগানো আছে এদের প্রত্যেকেরই লোকোমোটর অক্ষমতা আছে। দেশের অক্ষম ব্যক্তিদের সংখ্যা স্থিতিশীল নয়। প্রত্যেক বছর এই সংখ্যা বাড়তে থাকে। অনুমান করা যায় যে প্রত্যেক বছর ৩ মিলিয়ন ব্যক্তি ওই জনসংখ্যার সঙ্গে যোগ হয়ে থাকে।

অক্ষম মানুষদের কল্যাণমূলক কাজকর্ম ২০০৪-০৫-এ অক্ষমদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ হিসাবে (PWD) ২২৫.৫৪ কোটি টাকা ধার্য হয়। যার মধ্যে ৯৭.৩৭ কোটি ১৪ জানুয়ারি ২০০৫-এর মধ্যে খরচ হয়ে যায়। সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA)-এর মাধ্যমে অক্ষমতা সম্বন্ধে কার্যপ্রক্রিয়া চালু করার কথাও ভাবা হয়েছে। এই কার্যপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেসব শিশুর বিকলাঙ্গতা আছে তাদের বিশেষভাবে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে এই শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করার কথা বলা হয়েছে।

এই প্রকল্পটি কার্যকরী করা হয় জাতীয় ও অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এরা বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতাভুক্ত ব্যক্তিদের যেমন দৃষ্টিহীন, মূক, বধির ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি নানান কোর্স চালু করেছে যেখানে এই ধরনের অক্ষম ব্যক্তিদের পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে ১৪ জানুয়ারি ২০০৫-এর মধ্যে ১৩.৫৭ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

পার্সন্স উইথ ডিসএবিলিটি (PWD) অ্যাক্ট ১৯৯৫ এখনও চালু হওয়ার অপেক্ষায়। যে-কোনো ধরনের অক্ষম মানুষের পুনঃস্থাপনের জন্য শ্রমশক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে পাঁচটি কমপোজিট রিহ্যাবিলিটেশন কেন্দ্র (CRCs) গঠিত হয়েছে শ্রীনগরে, লখনউতে, ভোপালে, গুয়াহাটিতে এবং সুন্দরনগরে। যাদের হাড় গঠনের ক্ষেত্রে অক্ষমতা আছে বা মেরুদণ্ডের অক্ষমতা আছে তাদের জন্য আঞ্চলিক পুনঃস্থাপন কেন্দ্র (RRCs) গঠন হয়েছে চণ্ডীগড়ে, কটকে, জব্বলপুরে এবং বেরিলিতে। ১৩৩টি জেলাভিত্তিক পুনঃস্থাপন কেন্দ্র (DDRCs) তৃণমূল স্তরে পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে। DDRC-গুলি চালুও হয়েছে।

Assistance to the Disabled for Purchase/Fitting of Aids and Appliances প্রকল্পটির জন্য ৩৯.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে যার মধ্যে ১৪ জানুয়ারি ২০০৫-এর মধ্যে ১.১৮ লক্ষ উপকৃতদের জন্য খরচ হয়েছে। আর্টিফিশিয়াল লিম্বস ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন অক্ষম মানুষদের জন্য নকল অঙ্গাপ্রত্যঙ্গ তৈরি করে থাকে। Science and Technology Project in Mission Mode নামে একটি প্রকল্পও চালু করা হয়েছে।

এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক বরাদ্দ উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহারকে ব্যয়সাপেক্ষ করে তোলা। মেকানিক্যাল হাত, ইনটারপয়েনিটং ব্রেইল স্লেট, ব্রেইল মাইক্রোমিটার, প্লাস্টিক অ্যাসফেরিক লেন্স প্রভৃতি তৈরি করা হয়।

দীন দয়াল ডিসএবেল্ড রিহ্যাবিলিটেশন স্কিম সেইসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে আর্থিক অনুদান দেয় বিশেষত যারা কুষ্ঠরোগীদের নিয়ে কাজ করে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের শ্রমশক্তির উন্নতিকল্পে স্পেশ্যাল স্কুল তৈরি করার ক্ষেত্রেও আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। ২০০৫ সালে ৩৪.২৯ কোটি টাকা ৫০২টি ঐচ্ছিক সংগঠনকে এই ধরনের প্রকল্পের জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছে। ২০০৪-এর জুন পর্যন্ত UNDP-এর একটি প্রকল্প Support to Children with Disabilities চালু ছিল। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল সমাজকে সচেতন করা, একত্রিত করা এবং ক্ষমতায়িত করা যাতে এলাকার স্কুলগুলিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ওই এলাকার সমস্ত অক্ষম শিশুকে ওই প্রকল্পের ভেতরে আনা যায়। National Scholarship for Persons with Disabilities নামে একটি প্রকল্প ২০০৩-২০০৪-এ চালু ছিল। ওই প্রকল্পের অন্তর্গত ৩১৩টি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে পুরুষ ও মহিলা ছাত্রদের যারা অক্ষম কিন্তু প্রযুক্তিগত ও উচ্চশিক্ষাভিলাষী।

এখন স্থির করা হয়েছে যে যেসব শিশুরা মানসিক প্রতিবন্ধী, মূক ও বধির তাদের নবম ও দশম শ্রেণিতে পড়ার জন্য স্কলারশিপ দেওয়া হবে। আগে ম্যাট্রিক পাস করার পর এই ধরনের স্কলারশিপ দেওয়া হত। অনুপদ্রুত অঞ্চল বা পিছিয়ে পড়া এলাকায় এ ধরনের ক্রিয়াকর্মের বিস্তৃতির কথাও ভাবা হচ্ছে।

অক্ষমতার নানান ধরন ঃ

- সেরিব্র্যাল পালশি।
- বধিরতা

- কুষ্ঠ
- মানসিক প্রতিবন্ধী
- বহুবিধ অক্ষমতা
- শারীরিক প্রতিবন্ধী
- স্প্যাসটিক

৩.৩ গৃহহীনদের সমস্যা

যে-কোনো সামাজিক বিষয়ের মধ্যে গৃহহীনতা একটি বিশেষ সমস্যা। সমাজের কোনো অসুবিধার বহিঃপ্রকাশেই গৃহহীনতা ঘটে থাকে বলে ভাবা হয়। তবুও এই সমস্যাকে যতদূর সহজভাবে বোঝা দরকার। এমনকি গৃহহীনতা ধারণাটির সংজ্ঞা দেওয়াও কষ্টসাধ্য। এবং এজন্য এই ধারণাটির পরিমাপও সহজসাধ্য নয়।

দি. ইউ. এস. ডিপার্টমেন্ট অফ হাউজিং অ্যান্ড আর্বান ডেভালপমেন্ট গৃহহীন বা গৃহহীন ব্যক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে (১) যে ব্যক্তির স্থায়ী প্রাত্যহিক পরিমিত রাত কাটানোর ব্যবস্থা নেই তাকে গৃহহীন বলা যায়। (২) যে ব্যক্তির প্রাথমিকভাবে রাত কাটানোর জায়গা আছে, (ক) যা জনগণের বা ব্যক্তিগত জায়গা, যা অস্থায়ীভাবে রাত কাটানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। (খ) একটি প্রতিষ্ঠান যা কতগুলি ব্যক্তির রাত কাটানোর জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা করে। (গ) একটি জনসাধারণের বা ব্যক্তিগত জায়গা যা মানুষ ব্যবহার করে নিয়মিত/প্রত্যহ রাত কাটানোর জন্য।

গ্লোবাল আরবান রিসার্চ ইউনিটের (GURU) একটি সমীক্ষা "Attitudes to and Interventions in Homelessness : Insights from an International Study." তে গৃহহীন মানুষের সম্বন্ধে সাধারণ কতগুলি দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যাবে—

(ক) দি ভিলেন ঃ বিশ্বজুড়ে গৃহহীন মানুষদের অপরাধী হিসাবে দেখা খুবই সাধারণভাবে হয়ে থাকে। অপরাধী হিসাবে এই গৃহহীনদের খুব সহজে সাব্যস্তও করা যায়। তবে বেশিরভাগ দেশেই প্রাপ্তবয়স্ক গৃহহীনরাই অপরাধী হন, এরকম দেখা যায় না বিশেষত হিংসাত্মক অপরাধের ক্ষেত্রে। সাধারণ মানুষের নঞর্থক আচরণের জন্যই তাদের অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

(খ) দি বেগার ঃ জনমানসে আরো একটি সাধারণ ভাবনা হল যে এই গৃহহীন মানুষরা সবাই

ভিক্ষাজীবী যদিও দেখা গেছে যে কলকাতা শহরের গৃহহীনদের মধ্যে মাত্র ৮% ভিক্ষাজীবী। ভারতে বেশিরভাগ গৃহহীন মানুষই অস্থায়ী কর্মী যারা শহরে অনেক দূর যাতায়াত করে তাদের কর্মস্থলে পৌঁছায়। ঘানায় যদিও সাধারণ ধারণায় গৃহহীনদের ভিক্ষাজীবীই ভাবা হয় তবুও তাদের মধ্যে মাত্র ৩%-ই ভিক্ষাবৃত্তি করেন।

(গ) মানসিক অসুস্থতা ঃ গৃহহীনদের সম্বন্ধে আরো একটি সাধারণ বোধ যে তারা মানসিকভাবে অসুস্থ বা ব্যক্তিগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ। পেরুতে যারা রাস্তায় থাকেন, যাদের মাথার ওপর ছাদের ব্যবস্থা নেই তাদের সরকারিভাবে মানসিক অসুস্থ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ঘানার টামালে অঞ্চলে অক্সফ্যামের এক কর্মীর মতে গৃহহীন মানুষ আদতে মানসিকভাবে অসুস্থ যাদের সচলতা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

(ঘ) দি ইম্‌মর‍্যাল ঃ গৃহহীন মহিলাদের ওপর এই চিহ্নিতকরণের তকমা সাধারণভাবে লাগানো হয়ে থাকে। ইন্দোনেশিয়ায় গৃহহীন মহিলাদের সম্বন্ধে একটি শব্দ "তুনাসুসিলা" ব্যবহার করা হয় যার অর্থ 'যে মহিলার কোনো নৈতিকতা নেই'। বাংলাদেশেও যেসব অল্পবয়সি বিধবা বা ডিভোর্সী গৃহহীন মহিলাদের দেখা যায় তাদের দেহব্যবসায়ী হিসাবে চিহ্নিত করা হয় তাদের প্রকৃত যৌন ক্রিয়াকলাপের বিষয় না জেনেই।

(ঙ) দি ট্রানজিয়েন্ট ঃ গৃহহীন মানুষরা সাধারণভাবে সবসময়ই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাচল করেন। এজন্য তাদের ট্রানজিয়েন্ট বলা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় এদের "মালুন্ডা" বলা হয়। ইন্দোনেশিয়ায় এদের গেলানডাগান বলা হয়। চিনে এদের বলা হয় "মাঙ্গালিউ" যার অর্থ হল দিশাহীনভাবে ভবঘুরে জনসম্প্রদায়। এদের "লিউলাঘান" শব্দের সাহায্যেও চিহ্নিত করা হয় যার অর্থ ভবঘুরে। তবে দেখা গেছে যে মানুষ সাধারণভাবে এক জায়গাতে থাকে। যদি তারা ভবঘুরে হয় তবে তা কোনো সামাজিক চাপের কারণেই।

(চ) দি লোজার ঃ এই শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় কোনো একাকী বসবাসকারী পুরুষের জন্য। বস্তুত সামাজিক কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন, কোনো বন্ধনহীনতা থাকলে তবেই কেউ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় অনেক গৃহহীন পরিবার দেখা যায় যারা একসঙ্গে থাকে। এমনকি সবচেয়ে দরিদ্রতম অবস্থাতেও গৃহহীনদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় থাকে। তারা সব সময়ই একে ওপরের খোঁজখবর রাখে।

(ছ) দি **হেল্পলেস** ঃ অনেক ধর্মীয় সংগঠন গৃহহীন মানুষদের কোনো সামাজিক চাপের শিকার মনে করে। বহু বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে যারা গৃহহীন মানুষদের ছবি দেখিয়ে নিজেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গৃহহীন মানুষদের অনেক সময়ই আশ্রয়হীন অসহায় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই ধরনের আচরণ ভঙ্গুরতার সঙ্গে গৃহহীনতাকে এক করে ফেলে, যার ফলে গৃহহীন মানুষ সাধারণভাবে নিজের চেষ্টায় বাঁচার চেষ্টাটুকু যা করেন তাও গুরুত্ব পায় না। যেসব শিশুরা রাস্তায় বেড়ে ওঠে তাদের পক্ষে এভাবে বেঁচে থাকা শক্তি ও সাহসের পরিচায়ক। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বহু ফুটপাতে বেড়ে ওঠা শিশু তাদের বাবা-মা তাদের যেমনভাবে রাখে, তার থেকে অনেক ভালোভাবে নিজেদের রাখতে পারে।

গৃহহীন মানুষের উপর বেশিরভাগে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল দেখা যে,

(১) কেন গৃহহীনতা ঘটে ?

(২) বিশেষত কারা গৃহীনতার ফলে সবচেয়ে বেশি বিপদের মুখোমুখি হয়।

কোনো ব্যক্তিকে গৃহহীন করার ক্ষেত্রে যে উপাদানগুলি থাকে ঃ

● **দারিদ্র্য ঃ** যেসব মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে তাদের গৃহহীন হওয়ার বিপদ বেশি থাকে।

● **মদ ও ড্রাগের অপব্যবহার ঃ** প্রায় ৩৮% গৃহহীন কোনো নিষিদ্ধ বস্তুর অপব্যবহার করে থাকে। এই নিয়ে বিতর্ক আছে যে ড্রাগের ব্যবহার গৃহহীনতার কারণ বা ফলাফল কি না। তবে এ ধরনের নেশা যখন হয় গৃহহীনতার পরিবর্ত কিছু ঘটতে পারে না।

● **মানসিক প্রতিবন্ধকতা বা অসুস্থতা ঃ** সমীক্ষায় দেখা গেছে যে গৃহহীনদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের কোনো না কোনো মানসিক অসুস্থতা বা প্রতিবন্ধকতা আছে। আগেকার দিনে এই ধরনের মানুষদের মানসিক হাসপাতালে রাখা হত। ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স ফর মেন্টালি ইল III-এর মতে ক্যালিফোর্নিয়া শহরে প্রায় ৫০,০০০ মানসিকভাবে অসুস্থ গৃহহীন থাকে কারণ ১৯৫৭ থেকে ১৯৮৮-এর মধ্যে আঞ্চলিক পরিসেবা কেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। তবে অ্যাসারটিভ কমিউনিটি ট্রিটমেন্ট ও পাথ প্রোগ্রাম এই দুটি কর্মসূচির মাধ্যমে গৃহহীন এবং মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন।

● **প্রতিপালন সেবার পটভূমি ঃ** যারা প্রতিপালিত হন এমন গৃহহীন জনসংখ্যা অপ্রতিপালিত গৃহহীন জনসংখ্যার প্রায় ৮ গুণ।

● **গৃহের পীড়ন থেকে পালিয়ে আসা ঃ** যারা পরিবারের ভেতরে যৌন, শারীরিক ও মানসিক পীড়নের ফলে বাড়ি ছেড়ে চলে আসে, তারা অধিকাংশই গৃহহীন হয়ে পড়ে। এই ধরনের নিপীড়িত শিশুদের মধ্যে ড্রাগের নেশার প্রকোপও বেশি হয়ে থাকে। এর ফলে স্থায়ী ঠিকানা গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ১৯৯০ সালে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রায় অর্ধেক গৃহহীন নারী ও শিশু পরিবারে পীড়নের হাত থেকে বাঁচার জন্যই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।

● **জেল থেকে ছাড়া পাওয়া ব্যক্তি ঃ** এক সময় যারা কারাগারে বন্দি ছিল তারা পরবর্তীতে সমাজ পরিবার ও বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের হাতে খুব কমই সম্পদ থাকে। তাদের অপরাধের রেকর্ড থাকার জন্য কোথাও চাকরি পাওয়াও সম্ভব হয় না। এবং বহুদিন ধরে মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসা না হওয়ায়, কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাদের অধিকাংশই গৃহহীন হয়ে পড়ে।

● **যুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষ ঃ** যে-কোনো যুদ্ধের সময় অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। তাদের পক্ষে আবার বাড়িঘর তৈরি করা ব্যয়সাপেক্ষও হয়ে ওঠে। আবার যদি ওই সরকার পরাজিত হয় তাহলে নাগরিকদের সাহায্য করাও সম্ভবপর হয় না।

● **গণহত্যায় যারা বেঁচে থাকে ঃ** উদাহরণ ঃ ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে যারা বেঁচে গেছেন, অন্তরীণ জাপানি আমেরিকানরা।

গৃহহীনতার কারণ ঃ

● **ব্যক্তিগত ইচ্ছে ঃ** কেউ কেউ ইচ্ছে করেই স্থায়ী বসবাসের ঠিকানা গড়ে তোলেন না। যেমন— যারা ভ্রমণকারী বা যাদের নিজস্ব ধর্মীয় বা আত্মিক বিশ্বাস আছে (যেমন ভারতের যোগীরা)। বেশিরভাগ গবেষক মনে করেন যে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই এমন আছেন যারা ইচ্ছে করে স্থায়ী ঠিকানা গড়তে চান না। এও মনে করা হয় যে যারা চান যে তারা গৃহহীন থাকবেন, আসলে তাদের কোনো মানসিক অসুস্থতা আছে বা এমন জীবনযাত্রাই বেছে নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তাদের চাহিদা সামাজিকভাবে স্বীকৃত যা কিনা কোনো স্থায়ী আশ্রয় প্রকৃতপক্ষে সমর্থন করে না।

● **ড্রাগ ও মদের নেশা ঃ** যেসব ব্যক্তিরা কোনো স্থায়ী চাকরি বজায় রাখতে পারেন না বা বহুদিন ধরে ড্রাগ বা মদের নেশায় আচ্ছন্ন থাকেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরাই গৃহহীন। এর একটা কারণ এই যে মদের বা ড্রাগের নেশা থাকার জন্য এরা পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন। অন্যথায় এই পরিবার বা বন্ধুবান্ধব তাদের থেকে সহায়তার জাল তৈরি করতে পারতেন।

● **আয়ের অসাম্য ঃ** কারো কারো হাতে অধিকমাত্রায় সম্পদ ও অন্যদিকে আয়ের অনৈক্য বাড়ি তৈরির বাজার বা বাড়ি ভাড়ার হারকে এমন উচ্চতায় পৌঁছে দেয় যে বাড়িতে থাকার খরচ আকাশ ছোঁয়া হয়ে পড়ে।

● **বাড়ি তৈরির খরচ বেড়ে যাওয়া ঃ** সাধারণভাবে সম্পদ ও আয়ের বণ্টনের অনৈক্যের এক ফল হল বাড়ি তৈরির খরচ বেড়ে যাওয়া। তাছাড়া এই কারণে বিংশ শতাব্দীতে বাড়ির আয়তনও ক্রমশ ছোটো হয়ে যাচ্ছে।

● বেঁচে থাকার জন্য চাকরির অভাব।

● **প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঃ** হাজার হাজার নিউ ওরলিয়েন্ডস বা লুইসাজার বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা ক্যাট্রিনা হারিকেনের ফলে গৃহহীন হয়ে পড়েন বারবার।

২০০২ সালে ক্যালিফোর্নিয়া কোস্ট ইউনিভার্সিটিতে একটি গবেষণাপত্রে রবার্ট ই. ব্রিক্নার গৃহহীনতার প্রাথমিক কারণ অন্বেষণ করে সেগুলিকে একটি তালিকাভুক্ত করেন। এগুলি ক্রমিক না হলেও এগুলি কতগুলি বর্গের ভাগ বলা যেতে পারে।

১. বেকারত্ব

২. পর্যাপ্ত আয়ের অভাব (চাকরি চলে যাওয়া, বেকারত্ব ইত্যাদি)।

৩. গৃহের অভাব (উঠে যাওয়ার জন্য, বাড়ি তৈরি করতে না পারার জন্য ইত্যাদি)।

৪. শিকার হওয়ার ফলে (প্রাকৃতিক কারণে, অপরাধী হওয়ার জন্য, অপ্রকৃতিস্থ কারণের জন্য ইত্যাদি)।

৫. স্বাস্থ্যের সমস্যা।

৬. ব্যক্তিগত ইচ্ছে।

৭. পরিবার ভেঙে যাওয়ার জন্য (ডিভোর্স বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য বা পালিয়ে আসার জন্য)।

৮. মানসিক অসুস্থতা।

৯. কোনো ধরনের বস্তুর নেশা।

১০. জীবনঘাতক এমন জীবনযাত্রার অভ্যাস (কোনো নেশার বস্তুর কথা বাদ দিয়েও)।

উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশসমূহ ঃ বর্তমান সময়ে গৃহহীনদের সংখ্যা বিশ্বজুড়ে ক্রমশই বাড়ছে। কিছু তৃতীয় বিশ্বের দেশ যেমন ব্রাজিল, ভারত, নাইজেরিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় গৃহহীনতা ক্রমশ

বাড়ছে। এসব জায়গায় মিলিয়নের বেশি শিশু রাস্তায় থাকে এবং কাজ করে। চিন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিন্সেও গৃহহীনতা একটি সমস্যায় পরিণত হচ্ছে। তার কারণ মূলত প্রব্রজনকারী শ্রমিকদের জন্য যারা স্থায়ী ঠিকানা গড়ে তুলতে পারেন না এবং যাদের ক্ষেত্রে আয়ের অনৈক্য থাকায় শ্রেণিভেদ অত্যন্ত তীব্র।

কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক ভারত সম্পর্কে খুব সহজ সাধারণীকরণে পৌঁছানো যায়—বলা হয়ে থাকে ভারতের অস্তিত্ব তার গ্রামেই। যদিও এ কথা সত্যি নয় কারণ ব্যাপক হারে শিল্পায়ন, নগরায়নে, প্রাকৃতি সম্পদের বিকাশ, উন্নয়নের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক অগ্রাধিকার এবং আরও নানা কারণের জন্য ব্যাপক হারে গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরের দিকে প্রব্রজন ঘটছে।

১৯০০ সালে মাত্র ১১টি শহর ছিল যেখানে জনসংখ্যা ছিল ১ মিলিয়ন কিন্তু ২০০০ সালে প্রায় ৩০০টি শহর গড়ে ওঠে। ২০১০-এর মধ্যে আরও প্রায় ৫০টি শহর গড়ে উঠবে যেখানে ১৫ মিলিয়নের বেশি জনসংখ্যা হবে।

আজ ভারতে প্রায় বিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের বাস যার মধ্যে ১৬৪ মিলিয়ন বা ২৩% শহরে থাকে। এর থেকে বোঝা যায় যে ভারত প্রধানত গ্রামভিত্তিক দেশ হলেও এর শহরভিত্তিক জনসংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান।

যদি বম্বের কথাই বলা যায় তাহলে ২০ বছর আগে যেখানে ৪,০০,০০০ দখলকারী থাকত ৪.৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে সেখানে আজ ৪.৫ মিলিয়ন দখলকারী আছে ৯ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে। সুতরাং দেশ যেখানে ৫০% অগ্রসর হয়েছে সেখানে শহর বেড়েছে ১০০% এবং দখলকারীদের সংখ্যা বেড়েছে ১১০০%-এর বেশি।

প্রব্রজন ঃ শহরে মানুষ আসে তাদের সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এবং বিশ্বে এমন প্রব্রজন তেমন চোখে পড়ে না। মানুষ অনেক কারণে শহরে আসে—চাকরির খোঁজে, বন্যা, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এড়াতে। শহরে চলে আসার আরও একটি প্রধান কারণ গ্রামীণ দারিদ্র্য।

একটি অর্থনৈতিক সক্রিয় জীবন চালানোর পক্ষে গ্রামের মানুষদের কাছে তেমন সম্পদ থাকে না। যারা শহরে চলে আসে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ পুরুষ ও মহিলাই চাষি বা চাষক্ষেত্রে শ্রমিক। প্রব্রজনকারী শহরে পা রাখার পরই আশ্রয় নেয় দখলদারি হিসাবে রাস্তার ধারে বা প্রান্তিক কোনো এলাকায়। জনসাধারণের চোখের সামনে তারা তাদের আত্মীয়দের কাছে থাকে এই আশা নিয়ে যে

কর্তৃত্বের চোখে একদিন তারা পড়বে যে তারা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য জায়গা অধিকার করে আছে।

● এর উত্তর কোথায় ?

গৃহহীনতার সমাধান বিশেষ করে নিম্ন আয়ভোগী পরিবারের ক্ষেত্রে তৈরি বাড়ি প্রদানে নয় কিন্তু তাদের মধ্যে সৃষ্টিশীলতার ইচ্ছেকে জাগিয়ে তুলে নিজেদের বাড়ি ও পারিপার্শ্বিক গড়ে তোলায়।

সরকার অনেক সময়ই যা অনুভব করে না তা হল যে মানুষ নিজেই একটি বড়ো সম্পদ। একজন মানুষ তার অর্থনৈতিক ভিত্তি যত জোরদার করবে, সমাজে তার অবস্থান তত উন্নত হবে এবং একটি স্থায়ী বসবাসের জায়গা গড়ে তোলার পক্ষে তা সহায়ক হবে। এমনকি সে শহরে তার বসবাসের ঠিকনাও বদলাতে পারে।

যেসব কার্যধারায় এই কথাটি মনে রাখা হয় না যে মানুষের প্রব্রজনের একটি নির্দিষ্ট কাঠামো আছে সেগুলিই পরবর্তীতে অকৃতকার্য হয়। শুধুমাত্র একটি বাড়ি তৈরি করে দিলেই হয় না কারণ সেই ব্যক্তি পরবর্তীতে নিজের চেষ্টায় বাড়িটিকে আরো উন্নত করতেও সক্ষম হয় না বা ঐ অবস্থায় রাখতেও সক্ষম হয় না।

মানুষের মধ্যে সেই দক্ষতা, প্রয়োজনীয় সম্পদ, প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণের ক্ষমতা, একটি বাড়ি তৈরির ঐকান্তিকতা থাকে। প্রয়োজন মাফিক বাসস্থান গড়ে নেবার।

গ্রাম থেকে আগত পরিবারগুলি শহরের কোন কোন অঞ্চলকেও গ্রামীণ রূপ দেয় যা সরকারী আধিকারিক এবং পরিকল্পনাবিদদের মনে রাখা উচিৎ গৃহহীনদের জন্য নীতি নির্ধারন ও প্রকল্প রচনার সময়।

ধর্ম, লোকনীতি, সামাজিক সংগঠন, জীবনচর্চা আধুনিক শহরে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এগুলি শহুরে জীবনে বৈচিত্র্য দান করে। গ্রামীণ রূপকে বজায় রাখা একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ শহুরে প্ল্যানারদের কাছে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের প্রয়োজনীয়তা ঃ স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদরা বিবর্তনের ধীরগতিকে বুঝতে পারেন না যা বিশেষভাবে দখলদারিদের বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে জানা দরকার। সুতরাং এই ধরনের কার্যপ্রক্রিয়া বেশিরভাগই উন্নত দেশে ব্যবহৃত পদ্ধতির নকল হয়ে যায় যদিও আবহাওয়া ও সংস্কৃতির তফাৎ দুই দেশের মধ্যে অনেক বেশি।

সুতরাং পরিকল্পনাবিদ ও সরকারি আধিকারিকদের নিজেদের ভুলগুলো বোঝা উচিত এবং পরিকল্পনায় নতুন দিগন্ত নিয়ে আসা দরকার। এর ফলে প্রব্রজকদের সনাতনী থাকার ক্ষেত্রের কাঠামোর সঙ্গে তাদের প্রচেষ্টাকে মেলানো দরকার।

ঘরবাড়ি তৈরি করার ক্ষেত্রে নানান দিকের কথা ভাবতে হয়। সেজন্য স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদদের তাদের পেশাদার জীবনের বাইরে এসে আবেগ, মনস্তত্ত্ব, ঐকান্তিক ইচ্ছে, সামাজিক পরিসেবা, মধ্যবর্তী রাজনীতি প্রভৃতিকে মাথায় রেখে শুধুমাত্র পেশাদারি অংশগ্রহণ করলে চলবে না।

এই সমস্যাকে তার সামগ্রিকতায় দেখতে হবে। একটি পরিকল্পনা করলেই এক্ষেত্রে চলবে না। দরকার, বিশেষ আচরণ (বা আচরণের বদল)—এক নতুন ধরনের ভাবনা। পুরো বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন দরকার।

ঐকান্তিক ইচ্ছে, আন্তঃসম্পর্ক, পেশা, স্বনির্ভরতা সম্প্রদায়ে থাকার পক্ষে উপযুক্ত দক্ষতা, উন্নতিসাধন এই শব্দগুলির স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদের শব্দকোশে যেমন আছে, তার পাশাপাশি আদর্শ, মৌল কাঠামো, অর্থ, পরিসেবা ও জমি এই শব্দগুলিও রাখতে হবে।

উপসংহার

বাড়ি তৈরি শুধু একটি কারিগরি সমস্যা নয়। এটি একটি সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যাও। এর জন্য দরকার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। সুতরাং দরকার বিকেন্দ্রীকরণ, বিপ্রাতিষ্ঠানিকতা যা এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। স্বনির্ভর বাড়ি তৈরির প্রকল্প শুধুমাত্র আশ্রয়ই দান করে এমন নয় মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস ও সম্পদ তৈরি করতেও সাহায্য করে। একটি বাড়িকে একটি আশ্রয়ে পরিণত করতে সাহায্য করে।

এই সমস্যার গভীরতা যাই থাকুক না কেন, বা সম্পদ যতই সীমিত হোক না কেন, গৃহহীনদের আশ্রয়দান অসমাধানযোগ্য সমস্যা নয়। এটি একটি চ্যালেঞ্জ।

৩.৪ অনুশীলনী

(১) ভারতীয় সমাজে বৃদ্ধ মানুষদের যে সমস্যা আছে সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

(২) অক্ষম মানুষদের ধারণা, রূপ ও তাদের জন্য কল্যাণমূলক কাজের ব্যাখ্যা করুন।

(৩) গৃহহীনতা কাকে বলে? এটি কেন হয়? এর সম্ভাব্য সমাধানগুলি কী কী?

একক ৪ ❑ মহিলাদের সমস্যা ঃ ঐতিহাসিক পর্যলোচনা, সমস্যার রূপরেখা, মহিলাদের ওপর নির্যাতনের সমস্যা, সমস্যা মোকাবিলায় নীতি ও আইনি বিধান (Problem of women : historical revised problem of atrocities against women, policy to combat the problem)

গঠন

৪.১ মহিলাদের সমস্যা ঃ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

৪.২ সমস্যার রূপরেখা

৪.৩ মহিলাদের ওপর নির্যাতনের সমস্যা

৪.৪ সমস্যা মোকাবিলায় নীতি ও আইনি বিধান

৪.৫ অনুশীলনী

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ মহিলাদের সমস্যা ঃ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

নারী-পুরুষ উভয়েই ঈশ্বরের সৃষ্ট। কিন্তু সম্ভবত কোনো যুগেই তারা সমমর্যাদা ও সমসুবিধা ভোগ করেনি। তবু কালভেদে তাদের অবস্থানগত কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। স্বভাবতই বলা যায় সমস্যার ধরন, ব্যাপ্তি ও গভীরতায় কিছু কিছু পার্থক্য ঘটেছে বিভিন্ন কালে। উপনিষদের যুগে নারীর অবস্থান তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। নারী-পুরুষের মধ্যে লক্ষ্যণীয় কোনো বৈষম্য ছিল না। এমনকি ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই উপনয়ন দেওয়ার বিধি ছিল। বৈদিক যুগেও আধ্যাত্মিক কাজে, সাধন পথে, বিদ্যাচর্চায় নারী যুক্ত থেকেছে। ব্রহ্মচারিণী, ব্রহ্মবাদিনী, সিদ্ধি, তাপসী ইত্যাদি শব্দগুলির ব্যবহার যেহেতু এই যুগেই শুরু হয়েছে তাই অনুমান করা যায় যে এই যুগে নারী সম্মান ভোগ করেছে। উসস্তীর মতো বেদজ্ঞা এবং জবলার মতো সত্যনিষ্ঠা ও সাহসিনী নারী বৈদিকযুগের সমাজে বাস করেছেন। উপনিষদের

কালে গার্গী ও মৈত্রেয়ীর নামও উজ্জ্বল হয়ে আছে। এভাবেই আমরা দেখি যে, সুপ্রাচীনকালে নারী নৃত্য, গীত, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ছিলেন। অপলা, উর্বশ্রী, লোপামুদ্রা, কুন্তীও যথেষ্ট খ্যাতনাম্নী তাদের বিভিন্ন গুণের জন্য। ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় শিক্ষাতেই তারা শিক্ষিতা ছিলেন। বৌদ্ধযুগেও যথেষ্ট শিক্ষিতা নারী ছিলেন। যেমন—শুভা, অনুপমা, চিত্রলেখা, সুমেঘা ইত্যাদি।

এরপর ক্রমশ নানান সামাজিক সমস্যার প্রভাবে শিক্ষা সমেত বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী সমাজ সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করে। তাদের 'অবলা' হিসাবে চিহ্নিত হওয়া শুরু হল। বিবাহসমেত নানান প্রথা এর জন্য দায়ী। 'পতি পরমেশ্বর' ভাবনার বীজ রোপিত হল সমাজে। পর্দাপ্রথা, বহুবিবাহ এসব প্রথাও সমাজে প্রচলিত হয়ে নারীর অবস্থানগত অধোগতি নিশ্চিত করল।

বর্তমানকালে নারীর অবস্থান মিশ্রিত। একশ্রেণির নারী শিক্ষার সুযোগ পেয়ে, চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী হয়ে, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে অবস্থানগতভাবে ভালো জায়গায় রয়েছেন। আর এক শ্রেণির নারী কিছু কিছু সুবিধা ও অধিকার ভোগের মধ্য দিয়ে আবার কিছু কিছু বৈষম্য ও অত্যাচারের শিকার হয়ে দিনাতিপাত করছেন। কিন্তু সিংহভাগ নারী—বিশেষত গ্রামাঞ্চল ও শহরের বস্তি অঞ্চলের নারী অবস্থানগতভাবে তৃতীয় এক শ্রেণিতে রয়েছেন। এই শ্রেণিটি হল অশিক্ষা, কুসংস্কার, নির্যাতন, অবহেলা, মর্যাদাহীনতা, সামাজিক ও আর্থিকভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা, অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যের শিকার, ভবিতব্যকে মেনে নেওয়া শ্রেণি। যদিও নারীকে সর্বযুগেই কিছু কিছু সমস্যার মুখোমুখি হয়ে চলতে হয়েছে তবুও কালের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে তা ক্রমশ যেন জটিল আকার নিচ্ছে।

৪.২ সমস্যার রূপরেখা

মহিলাদের সমস্যাগুলি প্রধানত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক যেগুলি তাদের জীবনের স্বাভাবিক গতি বা বিকাশকে রোধ করে।

সমস্যাগুলির ধরন হল ঃ

(১) নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার সমস্যা (Problem of illiteracy & lack of education)

(২) সামাজিক বৈষম্য ও অধঃস্তন মর্যাদা (Social discrimination and inferior status)

(৩) নিয়ন্ত্রিত গতিবিধি ও নিরাপত্তার সমস্যা (Controlled movement & problem relating to safety)

(৪) পেশাগত ও পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে বৈষম্য (Wage discrimination)

(৫) অর্থনৈতিক পর নির্ভরতা (Economic dependence)

(৬) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমিত ক্ষমতাভোগ (Enjoying limited political power)

(৭) পণ বা যৌতুকপ্রথা (Dowry)

(৮) বাল্যবিবাহ (Child marriage)

(৯) হীনমন্যতা (Inferiority complex)

(১০) প্রশাসনিক ও পরিচালন কাজে সীমিত অংশগ্রহণ (Limited participation in Administrative and managerial role)

(১) নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা ঃ পুরুষের তুলনায় ভারতে মহিলাদের শিক্ষার হার অনেক কম। মহিলাদের লেখাপড়া শেখার খুব একটা দরকার আছে বলে মনে করা হয়নি। তারা ঘরে থেকে সংসারের কাজ করবে বা সন্তান লালনপালন করবে। এটিই ছিল সাধারণ ধারণা। ফলে তাদের শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীনতা রয়েছে প্রায় সর্বত্র। মহিলারাও যে অফিস কাছারিতে কাজ করে, অর্থ উপার্জন করতে পারে, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে, নিজের ও সংসারের দায়িত্ব নিতে পারে, নিজেদের ভাবনাচিন্তা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজকে এগিয়ে দিতে পারে এই ধারণার অভাবেই মহিলাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়নি। ফলে সমাজের ওপর থেকে নীচুতলা পর্যন্ত সকলস্তরেই অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা একটি সমস্যা হিসাবে মহিলাদের গ্রাস করেছে। এই বক্তব্যের সমর্থনে নীচে একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

টেবিল ঃ ১

সাক্ষরতার হার—বিভিন্ন সময়ে

গণনা বর্ষ	মহিলা	পুরুষ	ব্যক্তি
১৯৫১	৮.৮৬	২৭.১৬	১৮.৩৩
১৯৬১	২৮.০৩	৪০.৪০	২৮.০৩
১৯৭১	৩৪.৯৬	৪৫.৯৬	৩৪.৪৩

গণনা বর্ষ	মহিলা	পুরুষ	ব্যক্তি
১৯৮১	৪৩.৫৭	৫৬.৩৮	৪৩.৫৭
১৯৯১	৫২.২১	৬৪.১৩	৫২.২১
২০০১	৫৩.৬৭	৭৫.২৬	৬৪.৮৪

টেবিল ঃ ২

৬-১৪ বছরের মেয়ে যারা স্কুলে যায় না তাদের হিসাব ঃ

প্রদেশ	শতকরা সংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ	৩৭%
উত্তরপ্রদেশ	৫২%
রাজস্থান	৫৯%
বিহার	৬২%
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪৫%
মধ্যপ্রদেশ	৪৫%

উপরোক্ত তথ্য থেকে এটি স্পষ্টতই বোঝা যায় যে দশকেই পুরুষ অপেক্ষা নারীর সাক্ষরতা/শিক্ষার হার যথেষ্ট কম। ২০০১ সালেও সেই ব্যবধান প্রায় ২২ ভাগ। শিক্ষাক্ষেত্রেও কন্যা শিশু বা মেয়েরা যথেষ্ট সংখ্যায় বঞ্চনার শিকার।

(২) **সামাজিক বৈষম্য ও অধঃস্তন অবস্থান ঃ** সমাজে নারী পুরুষ সকলেরই সমান মর্যাদা, সমান স্বাধীনতা ও সমান অধিকার ভোগ করার বিধান আছে ভারতের জাতীয় সংবিধানে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের 'মানব অধিকার' ঘোষণাপত্রে। কিন্তু বাস্তবে ভারতবর্ষে বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে মহিলারা সেই মর্যাদা, স্বাধীনতা বা অধিকার তেমনভাবে পান না। সমাজের সকল স্তরে আজও মহিলাদের মর্যাদাহানি, স্বাধীনতা ও অধিকারহানি করা হয়। যা মহিলাদের বিকাশের বা অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় খাওয়াপরা থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও বৈষম্যের কারণে একজন কন্যা সন্তানকে একজন পুত্র সন্তানের থেকে আলাদা করে দেখা হয়। কন্যা সন্তানের মর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ে উদাস থাকা হয়। মহিলাদেরকে অধঃস্তন, কম জোরি, দুর্বল ভাবা হয়, যা মহিলাদের বেড়ে ওঠার পথে বিরূপ প্রভাব ফেলে। মহিলা বলেই সমাজে তাকে হেয় ও দুর্বল হয়ে

থাকতে হয়। শুধুমাত্র মহিলা বলেই সে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটাতে বা প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারবে না এই বিধি উন্নয়ন সহায়ক নয়।

(৩) **নিয়ন্ত্রিত গতিবিধি ও নিরাপত্তার সমস্যা ঃ** মহিলাদের ক্ষেত্রে সামাজিক নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় তাদের চলাফেরা, গতিবিধির ওপর। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ তাদের ওপরে চাপানো হয়। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে এই ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় না। পর্দাপ্রথা, শুধু গৃহস্থালির কাজে আটকে রাখা মহিলাদের বিকাশের পথে একটি বিরাট বাধা। মানুষের বিকাশকে বাস্তবায়িত করতে হলে তার ভিতরের শক্তি সম্ভাবনার প্রকাশ উপযোগী পরিবেশের জোগান দেওয়া জরুরি। বিভিন্ন কাজে যুক্ত থেকে, নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ব্যক্তি তার জ্ঞান, দক্ষতা ও গুণের প্রকৃত প্রকাশ ঘটাতে পারে। অধিকাংশ ভারতীয় মহিলা সেই সুযোগ থেকেই বঞ্চিত। সামাজিক নিরাপত্তার অভাবও অনুভব করেন ভারতের মহিলা সমাজ। স্বাধীনভাবে চলাফেরা, সামাজিক সুবিচার, সামাজিক নিরাপত্তা এগুলি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে, গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার। কেন সে এসব থেকে বঞ্চিত হবে? নিজের মত ও বক্তব্য প্রকাশ স্থান, কালের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধ নয়। কিন্তু এই স্বাধীন মত ও বক্তব্য প্রকাশের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাও দরকার।

(৪) **পেশাগত ও পারিশ্রমিকের বৈষম্যগত সমস্যা ঃ** এ দেশের প্রচলিত প্রথা ও দৃষ্টিভঙ্গি হল সমস্ত কাজ মহিলাদের জন্যে নয়, তার যোগ্যতা বা দক্ষতা থাকলেও। কিছু বিশেষ বিশেষ কাজ বা পেশা মহিলাদের জন্যে অলিখিতভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা অনুসারে কাজের অধিকার জন্মায়। কিন্তু উপযুক্ত মানসিক কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে মহিলারা সাধারণভাবে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। সমাজে পেশাগত বৈষম্য যেমন আছে তেমনি আছে একই কাজের জন্য পারিশ্রমিকের ভিন্ন ভিন্ন হার। একই কাজের জন্য পুরুষদের একরকম পারিশ্রমিক আর মহিলাদের আর এক ধরনের পারিশ্রমিক। সাধারণত অসংগঠিত ক্ষেত্রে এই বেতন বৈষম্য বিশেষভাবে বর্তমান। পেশা ও পারিশ্রমিকের এই বৈষম্য মহিলাদের অমর্যাদা প্রদান করে। সেহেতু এই বৈষম্য সমস্যা অচিরেই দূর করা প্রয়োজন।

(৫) **অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা ঃ** ভারতীয় মহিলাদের জীবনে অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা আর এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সব স্বাধীনতার মূলকথা। সেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ না

করা মহিলার সংখ্যা বিস্তর। সুতরাং স্বনির্ভর না হয়ে পরনির্ভর হয়ে আমৃত্যু অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে থাকতে হয় অধিকাংশ মহিলাকে।

(৬) **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমিত ক্ষমতা ভোগ** ঃ রাজনৈতিক আঙিনায় মহিলাদের বিচরণও পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলিতে আইন করে ৩৩ ভাগ মহিলার সদস্যপদ নিশ্চিত করা গেলেও ক্ষমতার উচ্চতম প্রতিষ্ঠানগুলিতে (বিধানসভা, লোকসভা এবং রাজ্যসভা) তাদের যোগদানের হার একেবারে নগণ্য। নীতি নির্ধারণের, পরিকল্পনা গ্রহণের এই পীঠস্থানগুলিতে তাদের ভূমিকা কোনোভাবেই উল্লেখযোগ্য নয়।

(৭) **পণ বা যৌতুক** ঃ বিবাহের সময় বা আগে-পরে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে যৌতুক বা পণ দেয়। এই পণ বা যৌতুক দেওয়ার রীতি কী শহরে কী গ্রামে সকল সমাজেই বিদ্যমান। বরপক্ষকে এই পণ 'টাকায়' অথবা বস্তুসামগ্রীতে দেওয়া হয়। যেটি ব্যয়সাপেক্ষ ও সামাজিকভাবে অপমানজনকও। এভাবে মেয়েপক্ষের কাছ থেকে পণ গ্রহণ মহিলাদের কাছে অপমানকর। মানুষ হিসাবে নারী-পুরুষ সমান। সুতরাং সংসার জীবনে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপেই এই ধরনের বৈষম্য তৈরি করা অত্যন্ত মর্যাদাহীন কাজ। এই পণের কারণে মহিলাদের বিবাহের পর শ্বশুরবাড়িতে নানা গঞ্জনা ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়। ছেলেপক্ষ তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পণ সামগ্রী না পেলে বধূ নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। অনেক সময় পণ সামগ্রী ও পণের টাকা না জোগাড় করতে পারলে মহিলার বিবাহ আটকে যায়। অনেক মহিলাকে সারা জীবন অবিবাহিত থাকতে হয়। নানা সামাজিক সমস্যা তৈরি হয় এই পণপ্রথার কারণে।

(৮) **বাল্যবিবাহ (Child marriage)** ঃ অল্পবয়সে বিবাহ আর একটি বড়ো সমস্যা মেয়েদের কাছে। সরকার আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করলেও কার্যত এই ব্যবস্থা সমাজের সর্বস্তরে এখনও বিদ্যমান। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষ ১৮ বছরের আগেই মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করছেন এই ঘটনা একেবারে বিরল নয়। কোনো মেয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিণত হওয়ার আগেই বিবাহ হলে পরবর্তীকালে নানা সামাজিক ও মানসিক সমস্যা তৈরি হয়। সুতরাং অল্পবয়সে বিবাহ ও পরিবার গঠন মেয়েদের কাছে এক কঠিন সমস্যা।

(৯) **হীনমন্যতা** ঃ সাধারণত দৈনন্দিন জীবনের প্রতিপদক্ষেপে একটি মেয়েকে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় যে, সে ছেলেদের থেকে সবদিক দিয়েই দুর্বল এবং আলাদা। কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে সামাজিক বাধানিষেধ থাকে অনেক। এর ফলে তার ব্যক্তিত্ব গঠনে কিছু ত্রুটি থেকে যায় এবং অনেকেই

কিছুটা হীনমন্যতার শিকার হয়। তার যোগ্যতা, দক্ষতা ও প্রতিভা থাকলেও অনেক সময় তা ঠিকঠাকভাবে বিকশিত হয় না। হীনমন্যতা এমন এক সমস্যা যা মানুষকে তার পরিপূর্ণতা প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে। একজন কন্যা বা মহিলা সাধারণত এই সমস্যার শিকার।

(১০) প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থার সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ অনেক কম ঃ

রাষ্ট্র, প্রদেশ, জেলা, ব্লক ও গ্রাম স্তরের প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যবস্থার সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের হার অত্যন্ত কম। এই অবস্থা প্রমাণ করে যে মহিলারা পুরুষের তুলনায় পশ্চাৎপদ। দ্বিতীয়ত, এর ফলে বিভিন্ন স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে নানা ত্রুটি থেকে যায়।

এদেশের প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ যথাযথভাবে থাকলে মহিলাদের পক্ষেও তাদের সমস্যা ও অসুবিধাগুলিকে নিজেদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও ক্ষমতা দিয়ে সমাধানের সঠিক পথ বার করা সম্ভব হত।

৪.৩ মহিলাদের ওপর নির্যাতনের সমস্যা

নারীর ওপর নির্যাতনও নতুন কোনো সমস্যা নয়। নির্যাতনের ঘটনা ও বৈচিত্র্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পণ ও যৌতুককে কেন্দ্র করে নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে নিয়মিত। এক্ষেত্রে, ধনী-নির্ধন, গ্রামীণ-শহুরে হিসাবে কোনো পার্থক্য নেই। যৌন-নির্যাতনের ঘটনা ও ধরনও ক্রমবর্ধমান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল, জল-স্থল-আকাশপথের যানবাহন, বসবাসের এলাকা, হাটবাজার, সাংস্কৃতিক-সামাজিক অনুষ্ঠান এবং এমনকি নিজের বাড়ির সদস্য ও আত্মীয়বর্গের দ্বারা যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে উদ্‌বেগজনকভাবে। আর্থিকভাবে স্বনির্ভর না হওয়ার কারণেও শারীরিক এবং মানসিকভাবে নির্যাতিত হতে হয় বহু মহিলাকে। নিয়োগকর্তা বা নিয়োগকর্ত্রীর হাতেও নির্যাতনের শিকার হতে হয় অধিকাংশ কর্মে নিযুক্ত মহিলাদের। সাধারণ শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার মহিলাদের কর্মস্থল হল মূলত অসংগঠিত কিছু ক্ষেত্র। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বাড়ির সহায়িকার কাজ। এইসব কাজে যুক্ত মহিলারা নানা রকমের নির্যাতন ভোগ করেন। দেহব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়া বা হতে বাধ্য হওয়া মহিলাদের নির্যাতনের ধরন ও মাত্রা আরও অসহনীয়। এভাবে আমরা দেখি যে নারী নির্যাতনের মতো অপরাধ ঘটে চলেছে জীবন জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। নির্যাতনের যে সামান্য খবর প্রকাশ্যে আসে তাই পীড়াদায়ক। আর যা সাধারণের অগোচরে থেকে যায় তার পরিমাণ অনুমান ক্ষমতার বাইরে।

৪.৪ সমস্যা মোকাবিলায় নীতি ও আইনি বিধান

মহিলাদের সমস্যা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে স্বাধীন ভারতবর্ষে নানা নীতি ও আইনি বিধান তৈরি হয়েছে। যেমন হিন্দু কোড বিলে মহিলাদের জন্যে ৬টি বিষয়ে আইনি সহযোগিতা ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে—(১) বিবাহ (২) বিবাহবিচ্ছেদ (৩) সম্পত্তির উত্তরাধিকার (৪) পোষ্য বা দত্তক (৫) অর্থনৈতিক কাজের অধিকার (৬) সর্বসাধারণের (Public) স্থানে প্রবেশ অধিকার। মহিলারা যাতে এইসব সুযোগ ভোগ করতে পারে প্রশাসন সে বিষয়টি দেখার ব্যাপারে সজাগ থাকবে। ১৯৫৮ সালে মহিলা শিশু শ্রমিক বন্ধ করার জন্যে এবং যৌন কর্মী হিসাবে কিশোরী, মহিলাদের বাধা দেওয়ার জন্যে আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন তৈরি হয়। ধর্ষণ ও বলাৎকার বিষয়ে সরকার ক্রিমিনাল আইন প্রণয়ন করেন। ধর্ষণ অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হলে সশ্রম কারাদণ্ডের চরম শাস্তির ব্যবস্থা আছে। মহিলাদের বিরক্ত করার (eve-teasing) ক্ষেত্রেও শাস্তিযোগ্য আইনি বিধান রয়েছে। অর্থ জরিমানা ও কারাবাস অপরাধীর জন্যে প্রাপ্য। নারী পাচার আর একটি অপরাধযোগ্য কাজ। সরকার এক্ষেত্রেও আইনি ব্যবস্থা নিয়েছেন অপরাধীর শাস্তির জন্য। কর্মস্থল বা অন্য কোথাও মেয়েদের প্রতি যৌন হয়রানি করা হলে শাস্তির বিধান রয়েছে। সম্প্রতি এই বিধান আরও কড়াকড়ি করার ব্যবস্থা হচ্ছে। অশোভনীয় আচরণ করা, তাদের বিরক্ত করা ইদানীংকালে বেড়ে যাওয়ায় প্রশাসন এ ব্যাপারে অনেক তৎপর হয়েছে। যারা এই ধরনের অপরাধমূলক কাজ করছে পুলিশ প্রশাসন তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা নিয়েছে। এ ব্যাপারে মানুষের মধ্যে চেতনা সঞ্চার করা বিশেষ প্রয়োজন। শুধুমাত্র আইনি ব্যবস্থায় এই সমস্যা প্রতিহত করা যাবে না। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতে হবে। তাহলেই নারীদের অনেক সমস্যা সমাজ থেকে দূর হয়ে যাবে। মহিলা ও পুরুষ উভয়কেই আরও বেশি শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সকলের জন্যে শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে। সরকার বাধ্যতামূলকভাবে সকলের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন। এই ব্যবস্থার সুযোগ সকলকে নিতে হবে। এই বিধান অনুসারে পণ প্রথার বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পণ দেওয়া ও পণ নেওয়া অপরাধ। কোনো পক্ষ পণের ব্যাপারে জোরজুলুম করলে বা পণ নিচ্ছে জানতে পারলে পুলিশ প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবে। এক্ষেত্রেও হাজতবাস ও জরিমানা দুই শাস্তিই হতে পারে। মহিলারা পরনির্ভরতা কাটিয়ে স্বনির্ভর হলে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সবরকম অর্থকরী কাজে অংশগ্রহণ করার স্বাধীনতা পেলে তাদের বিরুদ্ধে যেসব সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে,

তাদের উন্নতি ও অগ্রগতিকে বাধা দিচ্ছে, সমাজে বৈষম্যকে বজায় রাখছে সেগুলো দূর হবে। অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়া একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মর্যাদা ও সমান অধিকার আদায় করার জন্য শিক্ষা ও স্বনির্ভরতা (অর্থনৈতিক) এই দুটি অত্যন্ত জরুরি। শুধুমাত্র নীতি প্রণয়ন বা আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান সবসময় হয় না। দরকার সামাজিক চেতনা, শিক্ষা ও উদার মানসিকতা।

৪.৫ অনুশীলনী

(১) মহিলাদের সমস্যা বলতে কী বোঝেন? মহিলাদের সমস্যার বিশদ ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিন।

(২) মহিলাদের সমস্যা ও মহিলাদের ওপর নির্যাতন কি এক? দুটির বিষয়ে আলোচনা করুন।

(৩) মহিলাদের সমস্যার আইনি বা নীতিগত বিধান বিষয়ে তোমার বক্তব্য আলোচনা করুন।

৪.৬ প্রস্তাবিত পাঠ্যগ্রন্থ

(১) নারী সমাজের অবস্থা ও অবস্থান—রোকেয়া কবির

(২) ভারতীয় মহিলা—যশোধরা বাকচি সংকলিত।

(৩) নারী মুক্তি আন্দোলন—প্রতিবেদন বেজিং কনফারেন্স

একক ৫ ❑ নারী ও মেয়ে পাচার সমস্যা। তার প্রকৃতি, বিস্তৃতি, বিশালতা ও কারণ। পাচার নিবারণে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনি ব্যবস্থা (Problem of trafficking of women & girls, its nature, extent, magnitude & causes. Social, economic & legal measures for prevention)

গঠন

৫.১ নারী পাচার সমস্যার প্রকৃতি, বিস্তৃতি, বিশালতা

৫.২ কারণসমূহ

৫.৩ সমস্যা নিরসনে আইনি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা

৫.৪ অনুশীলনী

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ নারী পাচার সমস্যার প্রকৃতি, বিস্তৃতি, বিশালতা

কিছু অসাধু মানুষ অসদ্ উপায়ে সহজে অনেক বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য দুঃস্থ অল্পবয়সি মেয়ে থেকে মাঝবয়েসি মহিলাদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর করে। একেই নারী ও মেয়ে পাচার বলা হয়। এ কাজ শুধু একজনের দ্বারা সম্ভব হয় না। অনেক মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। তারা একটি চক্র বা গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করে, যাকে 'পাচার চক্র' বলা হয়ে থাকে। বিভিন্ন স্তরে কাজটি সংগঠিত হয়। একদল মানুষ বিভিন্ন অঞ্চলে, গ্রামে ঘুরে ঘুরে সম্ভাব্য মেয়ে ও মহিলাদের শনাক্ত করে। এই আড়কাঠির দল সেই খবর কোনো একটি চক্রের কাছে পৌঁছে দেয়। তারপর নানা অছিলায় এরাই তাদের সঙ্গে, তাদের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে পরিচিত হয় এবং অভাবী পরিবার ও গরিব মেয়েটিকে নানাভাবে প্রলোভন দেখায়। কখনও ভালো বিয়ের, ভালো খাওয়া-পরার, ভালো চাকরির আবার কখনও বা বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার। যারা এই প্রলোভনের শিকার হয় সেইসব মহিলা বা মেয়েদের সাধারণত কোনো সাময়িক আশ্রয়ে রাখা হয়।

পাচার হওয়ার আগে তাদের তোলা হয় নির্দিষ্ট কিছু বাড়িতে। এখানে অনেক সময় তাদের সঙ্গে যৌন অত্যাচার বা শারীরিক পীড়নও করা হয়। তারপর সুযোগমতো তাদের পাচার করা হয় দেশের/রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। মানুষের দারিদ্র্যের, অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু মানুষ এই ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে। আজ মহিলা পাচার শুধু দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এখন আন্তর্জাতিক একটি সমস্যা। আর এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা ছড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষের ভিড়ে। এদের জাল রাজ্য, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে অন্য দেশেও বিস্তৃত, প্রসারিত। সমস্যাটি গভীরতায় অনেক বেশি ভয়াবহ। বিশাল আন্তর্জাতিক চক্র, মাফিয়া ডন, শিক্ষিত বড়ো মাথা অসাধু ব্যক্তি এর সঙ্গে যুক্ত।

মূলত এদের বাধ্য করা হয় যৌনকর্মী হিসাবে কাজ করতে। যার আয়ের সিংহভাগই পাবে তার মালিক যে তাকে অর্থের বিনিময়ে কিনেছে। কোথাও আবার তাদের বাধ্য করা হয় গৃহকর্ম বা অন্য কোনো কাজে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে। নানা ধরনের অত্যাচার ও শোষণের শিকার হতে হয় তাদের। অনেক সময় স্থানীয় পাচারকারী থেকে রাজ্য, দেশ হয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে বেশ কিছু হাত ঘুরে এইসব পাচার হওয়া মেয়েরা পৌঁছে যায় বিদেশেও। এমনিভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, দুবাই ও আরব দুনিয়ার বিভিন্ন শহরে ভারতীয় নিম্নবিত্ত পরিবারে মেয়েরা পাচার হয়ে যায় 'চেইন সিস্টেমে'। সুতরাং এই জঘন্যতম অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে মহিলাদের অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে। এভাবে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ থেকেই মেয়েদের ভালো খাওয়া-পরা, বিলাসবহুল জীবনযাত্রার লোভ দেখিয়ে, কাজের লোভ দেখিয়ে, সু-পাত্রের সঙ্গে বিবাহের ও সামাজিক নিরাপত্তার লোভ দেখিয়ে পাচার করা হয় মোটা অর্থের বিনিময়ে। ছোটো, বড়ো, মাঝারি বিভিন্ন আকারের নানা চক্র এ কাজে যুক্ত রয়েছে। কোনো চক্র আঞ্চলিক স্তরে কাজ করে। কোনো চক্র জেলা বা গোটা দেশে কাজ করে। আবার কোনো চক্র আন্তর্জাতিক স্তরে চক্র হিসাবে কাজ করে। সকলেরই উদ্দেশ্য এদের অসৎ উপায়ে অর্থ রোজগার করা। নারীকে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ না দিয়ে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্নবস্ত্র, বাসস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে, তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ না ঘটতে দিয়ে মানুষ হিসাবে সবরকম অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে কিছু দুষ্কৃতি মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য নারীকে ব্যবহার করছে তাদের ব্যাবসার পণ্য হিসাবে, যার প্রকৃতি, বিস্তৃতি ও গভীরতা অনেক ব্যাপক। এই সুদূরপ্রসারী পাচার চক্রের হাল হকিকত আজ পর্যন্ত যেটুকু প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়েছে তাতে এটি আন্তর্জাতিক স্তরের অপরাধগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হিসেবে চিহ্নিত।

৫.২ কারণসমূহ

নানা কারণে ভারতবর্ষে নারী বা মেয়ে পাচার সংগঠিত হয়ে থাকে। তবে প্রধানত নিম্নলিখিত কারণগুলিই এই সমস্যার জন্য দায়ী ঃ

(১) **দারিদ্র্যতা ঃ** দারিদ্র্যতা মহিলা পাচারের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত। যেহেতু এ দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে তাই সেই সুযোগ নিয়ে, স্বচ্ছল জীবনের মিথ্যে প্রলোভনে ভুলিয়ে অল্পবয়েসি মেয়ে থেকে শুরু করে নানা বয়সের মহিলাদের অর্থের বিনিময়ে পাচার করা হয়। আর্থিক অনটন থেকে মুক্তি পাওয়ার লোভে পাচার হওয়া মেয়েদের অনেকে এদের চক্রান্তের শিকার হয়।

(২) **নিরক্ষরতা এবং অচেতনতা ঃ** নিরক্ষরতা এবং অচেতনা হল এই সমস্যার পিছনে আরও একটি বড়ো কারণ। এই ধরনের মানুষকে সহজেই ষড়যন্ত্রের শিকার করা যায়। পাচারকারীরা এই সুযোগটিই নিয়ে থাকে পাচারের ক্ষেত্রে।

(৩) **সে মহিলা ; সে দুর্বল ঃ** লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে মহিলারা দুর্বল—মানসিক ও শারীরিকভাবে। সুতরাং বাড়ির অভিভাবকরা যেমন তার ওপর জোর খাটায় তেমনি পাচারকারীরাও নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।

(৪) **যৌন ব্যবসা একটি লাভজনক ও চাহিদাজনক ব্যাবসা ঃ** প্রাচীনতম একটি পেশা যৌন ব্যাবসা যার চাহিদা আধুনিক যুগে নানা কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে সারা বিশ্ব জুড়েই। ভারত তার ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহার করা হচ্ছে এই চাহিদাকে বাড়াতে। এই ব্যাবসার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছে। এই লাভজনক ব্যাবসার কাজ চালানোর ক্ষেত্রে নারী পাচার/নারীর জোগান অত্যন্ত জরুরি। তাই সুপরিকল্পিতভাবে নারী পাচারের গোপন ব্যাবসা চলছে দেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে অত্যন্ত উদ্‌বেগজনকভাবে।

৫.৩ সমস্যা নিরসনে আইনি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ঃ

(ক) **সামাজিক পদক্ষেপ ঃ** সামাজিকভাবে মহিলাদের পুরুষের সমান মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব দেওয়া উচিত যাতে তারা নিজেদেরকে বা অন্যরা মহিলাদেরকে দুর্বল, হেয়, অসমান না ভাবে। লিঙ্গ

বৈষম্যের কারণে সামাজিক বৈষম্য যেন কোনো ভাবেই তৈরি না হয় তা দেখা দরকার। এ বিষয়ে তাদের সুযোগ ও অধিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই বোধ বা চেতনা জাগ্রত করা দরকার। নারী পুরুষের মধ্যে সব ধরনের সামাজিক বৈষম্য দূর হলে নারীর আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা জন্মাবে। সুতরাং সামাজিক বৈষম্য দূর হওয়া অত্যন্ত জরুরি। নিরক্ষরতা বা অশিক্ষা দূর করা, শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা এবং সচেতনতার হার বৃদ্ধির মাধ্যমেও এই সমস্যার নিরসনে সাহায্য করা সম্ভব।

সামাজিক সমতা, সামাজিক স্বীকৃতি, শিক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার পেলে নারী পাচার নিবারণের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। সুতরাং সরকার ও সমস্ত জনসাধারণকে এই ব্যাপারটি মাথায় রাখতে হবে। এবং নারীর ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ তাকে দিতে হবে। পুরুষদের সঙ্গে নিয়ে নারী পাচার প্রতিরোধ কমিটি তৈরি করে গ্রামে গ্রামে নারী পাচার বন্ধ করার ব্যবস্থা আর একটি সামাজিক কাজ।

(খ) **অর্থনৈতিক পদক্ষেপ** ঃ দারিদ্র্য নারী পাচারের আর একটি বড়ো কারণ। অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকতে হলে তার নিজের ইচ্ছার তেমন মূল্য থাকে না। তাই এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। শিক্ষার মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মহিলাদের কাজের উপযোগী করে তোলা দরকার। কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে স্বাধীনভাবে নতুন জীবনের পথে অগ্রসর হলে আপনা থেকেই নারী পাচার কমে আসবে। সুতরাং মেয়েদের অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসম্পন্ন করে তুলতে হবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাদের অন্য নানা ধরনের সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে চালানজনিত সমস্যার মোকাবিলায় সাহায্য করবে।

(গ) **আইনি ব্যবস্থা** ঃ নারী পাচাররোধের উপযোগী কিছু আইনি ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু নারী পাচার নিবারণে আরও কঠোর শাস্তির জন্য পাচারকারীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করা দরকার। এটি ক্রিমিনাল আইনের আওতায় রয়েছে, তবুও অপরাধী মানুষেরা সেভাবে দৃষ্টান্তযোগ্য সাজা পাচ্ছে না। প্রশাসনের এ ব্যাপারে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করে প্রয়োজনে আরো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার সেভাবে প্রচার ও প্রতিরোধের কড়া ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। জনমত তৈরি করা, গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় নারী পাচার কমিটি করে আইনি ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা জরুরি। আইন প্রণয়ন করে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয় কিন্তু আইন প্রণয়ন

করে গরিব মেয়েদের সবরকম সুযোগসুবিধা, শিক্ষার ব্যবস্থা, আর্থিক উন্নতি ঘটানোর ব্যবস্থা করা হলে যে কারণে নারী পাচার অনেক সহজ একটি ব্যাপার তা রোধ করা সম্ভব হয়।

আইনি ব্যবস্থা দরকার অপরাধ নিবারণে, অপরাধীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে। তেমনি আইন করে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত পরিচিত বা অপরিচিত কোনো নারী বা পুরুষের কথার ওপর বিশ্বাস করে এরকম ক্ষেত্রে কোনো মেয়ে বা মহিলা বাড়ি ছাড়ার আগে স্থানীয় পুলিশ প্রশানকে সব তথ্য জানাবে এবং তাদের সম্মতিতে সেই ব্যক্তির সঙ্গে কোথাও যেতে পারবে। এতে অন্তত প্রশাসন একটু খোঁজখবর নিয়ে বা এর সত্যতা যাচাই করার কিছুটা সুযোগ পাবে।

সাপ্রেশন অফ ইম্মরাল ট্রাফিক অ্যাক্ট ১৯৫৬ চালু হয় সারা ভারতে। এই আইনের ফলে, মহিলা ও মেয়ে পাচারও একটি ক্রিমিনাল অপরাধ বলে গণ্য হয়। এর আগে ১৯৩৩ সালে বেঙ্গল সাপ্রেশন অফ ইম্মরাল ট্রাফিক আইন, ১৯৩৩ চালু হয়েছিল। এই আইনে মূল্যবান সামগ্রী, মহিলা, শ্রমিক, ইত্যাদির চোরাচালান অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। বর্তমানে ইম্মরাল চোরাচালান আইনের ফলে অপরাধীর জরিমানা ও স্বশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। এই ধরনের অপরাধ গুরুতর ক্রিমিনাল অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

৫.৪ অনুশীলনী

(১) নারী ও মেয়ে পাচার সমস্যার ব্যাপ্তি ও গভীরতা ব্যাখ্যা করো। এর কারণ কী আলোচনা করো।

(২) নারী পাচার সমস্যা সমাধানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনি ব্যবস্থা কী নেওয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে করো?

(৩) এই সমস্যা সমাধানে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?

৫.৫ গ্রন্থপঞ্জি

(১) Personal laws & women—Malladi subhamma

(২) The law of the land—Prabha Krishnan

একক ৬ ❑ ভারতে গণিকাবৃত্তির সমস্যা

গঠন

৬.১ ভূমিকা

৬.২ ধারণা

৬.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৬.৪ প্রকারভেদ

৬.৫ বিস্তৃতি ও প্রসার

৬.৬ আর্থসামাজিক ও স্বাস্থ্যের অবস্থা

৬.৭ শিশু যৌনকর্মীদের দুর্দশামূলক অবস্থা

৬.৮ গণিকাবৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধমূলক কাজ

৬.৯ সমস্যার কারণের পেছনে যুক্তি

৬.১০ গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে আইনি ব্যবস্থা

৬.১১ সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হস্তক্ষেপ

৬.১২ অনুশীলনী

৬.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ ভূমিকা

ভারত বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। বর্তমান ভারত যে সামাজিক সমস্যাগুলির সম্মুখীন হচ্ছে তার মধ্যে অনৈতিক পাচার অন্যতম। আমাদের দেশ ছাড়াও অন্য দেশগুলিও বর্তমানে নানা কারণের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বস্তুত এর বিস্তৃতি এতটাই যে এর বিপদসংকেত ছড়িয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ ও সরকারের মধ্যে। আমরা জানি, সামাজিক পাপের উপস্থিতি ব্যক্তির পরিবারের ও সমাজের খুশি ও স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। প্রকৃতপক্ষে আগের সময়ের তুলনায় বর্তমানে এই সমস্যাটি সবার নজর কেড়েছে।

৬.২ ধারণা

গণিকাবৃত্তি বলতে বোঝায় অর্থ ও জিনিসের বিনিময়ে দেহ বিক্রয় করা। এই ধারণাটিকে স্পষ্টভাবে বুঝতে আরও কয়েকটি সংজ্ঞা আলোচনা করা যাক।

(i) গণিকাবৃত্তি হল বাছবিচারহীন কামুকভাবে নিজের দেহ উৎসর্গ করা।

(ii) গণিকা এমন এক ব্যক্তি যিনি সমলিঙ্গের বা বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের লালসা তৃপ্তিকেই তার জীবিকা করেছে। (Eliss)

(iii) গণিকাবৃত্তি হলো বাছবিচারহীনভাবে মূল্যের বিনিময়ে, আঞ্চলিক আর্থিক ব্যবস্থার জটিলতার ওপর নির্ভর করে যিনি তার যৌনতায় অন্যকে অবাধ প্রবেশ করতে দেন। (International Encyclopaedia of Social Science)

(iv) কোনো মূল্যের বিনিময়ে বাছবিচারহীনভাবে যৌনসহবাসের জন্য যে মহিলা নিজেকে উৎসর্গ করে তাকে গণিকা বলে। (Webster's Dictronary)

(v) কোনো আবেগহীন সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে অর্থের মারফত যথেচ্ছ ভাবে যৌনতার বিনিময়কে গণিকাবৃত্তি বলে। (Encyclopaedia Britannica)

(v) অভ্যাসবশত মাঝেমধ্যে যৌন মিলন যা কমবেশি যথেচ্ছ তা কিছু অর্থের বিনিময়ে ঘটলে তাকে গণিকাবৃত্তি বলে। (Mr. Geoffrey)

(vii) অর্থ অথবা কোন বস্তু বিনিময়ের মাধ্যমে কোন মহিলা যখন যথেচ্ছ ও বাছবিচারহীনভাবে নিজের শরীরকে যৌনকার্যে ব্যবহার করতে দেয় তখন তাকে গণিকাবৃত্তি বলে। (SIT Act)

ওপরের এই সংজ্ঞাগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে গণিকাবৃত্তির সঙ্গে নিম্নোক্ত উপাদানগুলি সংযুক্ত।

(ক) যথেচ্ছ যৌনসহবাস।

(খ) বিনিময় ব্যবস্থা।

(গ) কোনো তৃপ্তিদান/সন্তোষণের ক্ষেত্র নেই।

(ঘ) আবেগ, স্নেহ বা ভালোবাসার অনুপস্থিতি।

একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে গণিকাবৃত্তির সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত বা প্রাক্‌বিবাহ যৌন সম্পর্কের সঙ্গে একে এক করে দেখা ঠিক নয়। অতি আকর্ষণ বা শারীরিক সম্পর্কের ওপর

ভিত্তি করে ভালোবাসা বা ধর্ষণ হিসাবেই ওই সম্পর্কগুলি যেমন আত্মীয়দের সঙ্গে, বাড়ির কর্মচারীর সঙ্গে বা অচেনা মানুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক হিসাবে দেখা উচিত। সুতরাং এইসব সম্পর্কে যথেচ্ছাচার বা বিনিময়ের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রমীলা কাপুর বলেছেন, "Human sexual behaviour including the sale of sex, has long been the focus of attention. People have generally biased attitude towards prostitution and it becomes very difficult to look at the facts objectively. I have come to realise that these girls are simply girls who have been in trouble.

৬.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির মতোই গণিকাবৃত্তি সমান পুরোনো। ধর্মীয় কাব্যগ্রন্থ যেমন—মহাভারত বা জাতকে আমরা গণিকাদের চিহ্নিত করতে পারি। মনু, গৌতম, বৃহস্পতি—হিন্দু শাস্ত্রকাররা এবং কৌটিল্য গণিকাবৃত্তিকে চাপা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। যার থেকে বোঝা যায় যে ওই সময়ে এটি ঘটত। পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যৌন সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও নৈতিকতার একটি দ্বৈতনীতি সমাজ স্বীকৃত হয়ে এসেছে যেখানে পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক রাখতে বাধা দেওয়া হয়নি কিন্তু মহিলাদের দেওয়া হয়েছে। তাই একটি বিশেষ শ্রেণির মহিলারা ওই পুরুষকে বিবাহ বহির্ভূত যৌনতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করার জন্য তৈরি হয়। প্রাচীন ভারতে জমিদার, ব্যবসায়ী বা জমির মালিকদের মতো অভিজাতরা এমন ধরনের মহিলাদের তাদের কর্তৃত্বাধীন রাখতেন। পৌরাণিক যুগে, আমরা দেখেছি দেবদাসীদের উপস্থিতি—যারা ছিলেন ধর্মীয় ক্ষেত্রে গণিকা। মুসলিম যুগে এই অভ্যাস হারেম ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রচলিত ছিল। এবং রাজশাসিত রাজ্যের অবলুপ্তির পর সাধারণ গণিকাদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সভ্যতার ধাপগুলির মধ্য দিয়ে গণিকাবৃত্তি বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে। বিভিন্ন কারণের জন্য এই অভ্যাস ত্বরান্বিত হয় ষষ্ঠদশ শতকের থেকে। কিন্তু তা ভারতে সামাজিক সমস্যারূপে প্রকাশিত হয় ঊনবিংশ শতকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর। অন্যান্য দেশেও এই অভ্যাসের অস্তিত্ব দেখা যায়। ব্যবিলনে কিছু মাত্রায় গণিকাবৃত্তি বাধ্যতামূলক ছিল। মধ্যযুগে একটি বিশেষ ধর্মের ধর্মীয় সংগঠন গণিকাদের আয়ের অংশ থেকে ভাগ নিতেন।

৬.৪ প্রকারভেদ

গণিকাদের এই কয়েকটি রূপে বিভক্ত করা যায়—

(i) ব্রথেল ইনমেটস ঃ সাধারণভাবে এরা বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহিত হয়ে এসে ব্রথেল মালিকদের দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এরা ব্রথেলে থাকতে বাধ্য হয় এবং সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে এদের মিশতে দেওয়া হয় না। তারা বেশিরভাগই গ্রামীণ এলাকা থেকে আসা দরিদ্র। এদের মূল্যহার তুলনামূলকভাবে কম।

(ii) কল গার্ল ঃ এই ধরনের গণিকারা সাধারণভাবে তাদের ব্যাবসা স্বাধীনভাবে চালায়। কখনো-কখনো দালালের সাহায্যও নেয়। তারা সম্মানীয়, মার্জিত, অভিজাত গণিকা যাদের মূল্যহার খুব বেশি। সাধারণভাবে তারা শিক্ষিত ও প্রগল্‌ভ। তারা কৌতূহলোদ্দীপক কথা বলতে পারে এবং ভালো জায়গায় থাকে। তাদের দূরাভাষে যোগাযোগ করতে হয়। পুরুষ ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় কোনো দালালের মাধ্যমে বা ক্রেতার সঙ্গে সরাসরিভাবে। তারা তাদের পেশা গোপন করতে সাধারণভাবে সফল হয়ে থাকে। তারা বেশিরভাগই স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, অফিসযাত্রী, গৃহকর্ত্রী, শিক্ষিত বেকার, সাধারণ অভিনেত্রী ইত্যাদি।

(iii) স্ট্রিট গার্ল ঃ এরা গণিকাদের মধ্যে একটি শ্রেণি যারা ক্রেতাদের রাস্তার ধারে, নৌকায়, বাগানবাড়িতে, পরিত্যক্ত বাড়িতে বা কোনো গোপন স্থানে নিয়ে গিয়ে তাদের ব্যাবসা চালায়। এরা সাধারণভাবে খুবই দরিদ্র এবং এদের মূল্যহার খুবই কম।

(iv) ফ্লাইং টাইপ ঃ আরও এক ধরনের গণিকা দেখা যায় যারা ফ্লাইং। এরা হাইওয়ে, ফেরিঘাট, বিভিন্ন ধরনের হোটেল ইত্যাদিতে ক্রেতার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। এদের রেলওয়ে স্টেশনেও দেখতে পাওয়া যায়।

৬.৫ বিস্তৃতি ও প্রসার

বর্তমানে ব্যাপক শিল্পায়ন ও নগরায়ণের সঙ্গে এই সমস্যাটি সারা দেশেই তীব্র আকার ধারণ করেছে। গ্রামীণ এলাকাগুলোও এর আওতার বাইরে নয়। টাটা ইনস্টিটিউট অফ

সোশ্যাল সাইলেন্সের তরফে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভারতে ২০ লাখ গণিকা আছে এবং তারা ৮১৭টি নিষিদ্ধ পল্লিতে থাকে। এ ছাড়াও ৫৮ লাখ শিশুর মা-রা জানেন না তাদের বাবার পরিচয়। গণিকাদের এই সংখ্যার মধ্যে কল গার্ল বা সমাজের উঁচুতলার গণিকাদের বা স্ট্রিট প্রস্টিটিউটদের ধরা হয়নি। বড়ো বড়ো শহরে বর্তমানে কল গার্লদের নিয়ে সমস্যার বিস্তার খুবই বেশি। নিষিদ্ধ পল্লির সংখ্যাও গুরুত্বপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জেলা শহরগুলিতেও কিছু কিছু এলাকায় এমন ব্যাবসা চলছে। হাইওয়ের ধারে স্ট্রিট গার্ল ও ফ্লাইং প্রস্টিটিউটদের সংখ্যা বাড়ছে। ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, দিল্লি এবং কোলকাতায় গণিকাদের সংখ্যা প্রচুর। তুলনায় পাটনা, চণ্ডীগড় ও ভুবনেশ্বরে এদের সংখ্যা কম।

শুধুমাত্র কলকাতাতেই ১৮ কোটি টাকার মত গণিকাদের জন্য খরচ হয়ে থাকে। এই অঙ্কের ওপর মদ, খাবার, টিপসের জন্য আলাদা খরচ হয়। সারা ভারতে এই ব্যবসায় লেনদেন হয় বছরে ৫০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। এই ছবিটির সবচেয়ে দুঃখজনক দিক হল যে গণিকারা তার আয়ের খুব কম অংশই নিজেরা ব্যবহার করতে পারে। ব্রথেল মালিকদের হাতে, পুলিশের হপ্তা আদায়ে, দালাল, সুদখোর, বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, ওষুধেই বেশিরভাগ টাকা খরচ হয়ে যায়। তার ফলে ৪০-৪৫ বছর বয়সের পর থেকে তাদের আয় আরও কমে যাওয়ায় তারা ক্রমশ ঋণের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে থাকে।

যেসব দেশে বৈধতা প্রদান (লাইসেন্স) চালু হয়েছে, সেখানে সমস্যাটির বিস্তারকে পরিমাপ করা সম্ভব হয়। ভারতের মতো দেশে, খুব অল্প সংখ্যক গবেষণা হয় যা থেকে এই সমস্যা বিষয়ে গভীরভাবে জানা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে ফ্লাইং গার্লদের এবং কল গার্লদের ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ই অজানা থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্যাটির প্রসার ও বিস্তৃতির নির্ধারণ জটিল আকার ধারণ করে। তবে বলা যায় যে এই সমস্যাটির ক্রমশই বড়ো আকার ধারণ করছে এবং বড়ো শহর যেমন কোলকাতা, মুম্বাই, দিল্লি, পুনে, ব্যাঙ্গালোরে ক্রমশই এটি একটি বিপদজনক অবস্থায় পৌঁছাচ্ছে।

৬.৬ আর্থসামাজিক এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা

● যেহেতু বেশিরভাগ ব্রথেলই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এবং এই পরিস্থিতির শিকারদের স্বল্পাহার

দেওয়া হয় এরা প্রায় প্রত্যেকেই এই রোগগুলির মধ্যে কোন এক বা একাধিক রোগের শিকার হয়— যৌনব্যাধি, যক্ষ্মা, রক্তশূন্যতা, এইডস, চর্মরোগ, সর্দিকাশি, মানসিক অস্থিরতা।

● এই ব্যবস্থায় এই মহিলাদের ওপর নানাধরনের শোষণ চলে ও এই মহিলারা পতিতা হিসাবে চিহ্নিত হয়।

● কোনো সমাজই এই বৃত্তি স্বীকার করে না কিন্তু এটিকে প্রয়োজনীয় সামাজিক পাপ হিসাবে মেনে নেয়। সুতরাং এই সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আন্তরিক নয়।

● আপাত প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই অভ্যাস সভ্যতার প্রত্যেক স্তরে বাস্তবে উপস্থিত থাকে। এই অভ্যাস কেউ কেউ মেনে না নিলেও সমাজের অনেকেই এই অভ্যাসে অংশ নেন।

● এই সমস্যাটি শুধুমাত্র মহিলা বা মেয়েদের সমস্যা নয়। এই সমস্যাটির মোকাবিলার জন্য এটিকে সার্বিকভাবে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের নিরিখে দেখা দরকার। কিন্তু বাস্তবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এর থেকে আলাদা।

● একবার একটি মেয়ে বা মহিলাকে গণিকা হিসাবে চিহ্নিত করলেই, তাকে আর একজন সম্পূর্ণ ব্যক্তি যার নিজস্ব প্রয়োজন, ইচ্ছা, ব্যক্তিগত সমস্যা, সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে এমন মনে করা হয় না।

● তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে দেওয়া হয় না। এদের সন্তানদের আকস্মিকভাবে জন্ম হয়েছে বলে মনে করা হয় এবং এদের অস্পৃশ্য বলে মনে করা হয়।

● এটি একটি মানবিক এবং সামাজিক সমস্যা যার নৈর্ব্যক্তিক (unbiased) পরীক্ষা প্রয়োজন যা খুব কমই বাস্তবে ঘটে থাকে।

পেশাটির ওপর তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

সমাজবিজ্ঞানীরা এবং সাধারণ মানুষ গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেন। এগুলি হল—

(১) নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি (মর‍্যালিস্টিক ভিউ) গণিকারা বাজারি ভোগ্যবস্তু, স্বাভাবিকভাবে যা সমাজে স্বীকৃত হয় না।

(২) বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি (রিয়্যালিস্টিক ভিউ) এই সমস্যাটির গভীরতা আছে যদিও এটি সম্মানীয় পেশা নয়। সুতরাং এদের বাস নিষিদ্ধপল্লিতেই হওয়া উচিত।

(৩) উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি (লিবার‍্যাল ভিউ) অন্যান্য পেশার মতো এটিও একটি পেশা। এটিকে আইনি বৈধতা দেওয়া উচিত যাতে এই পেশায় নিযুক্ত যারা, তারা সম্মানীয় জীবনযাপন করতে পারে।

৬.৭ শিশু যৌনকর্মীদের দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা

গণিকাদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ বিবাহিত। তাদের মধ্যে অনেকেই এই পেশায় আসার আগে থেকে বিবাহিত ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেরই সন্তান আছে। কেউ কেউ হয়ত হঠাৎই মা হয়ে গেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো জানেন না তাদের সন্তানের বাবা কে। এই যৌনকর্মীদের সন্তানদের দুর্দশা খুবই কষ্টদায়ক। সমাজে তাদের হীন চোখে দেখা হয়। তারা তাদের মায়ের জীবন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যায় অল্প বয়স থেকে এবং তাদের মধ্যে অবেগজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। তারা ভালোবাসা, স্নেহ, স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন পায় না যা তাদের জীবনকে আরও দুর্দশাপূর্ণ করে তোলে। তাদের মায়েদের পেশার প্রকৃতি, কম আয়ের জন্য এই শিশুরা সঠিক নজর, শিক্ষার সুযোগ বা স্বাস্থ্যের সুযোগ সুবিধাগুলিও পায় না। সঠিক বাসস্থান না থাকায় তারা সারাদিন ঘুরে বেড়ায় এবং রাতে যেখানে-সেখানে শুয়ে পড়ে। সমাজ তাদের সেভাবে মর্যাদা দেয় না এবং পুরুষ শিশুরাও অবহেলা পায়। কন্যা শিশুরা তুলনায় সেবা পায় কেননা তারাই ও ব্রথেল মালিকের কাছে সাধারণত বন্ধক থাকে। তবে এই শিশুদের ওপর চিহ্নিতকরণ চলে যে তারা অবৈধ।

শিশু যৌনকর্মীদের দুর্দশা যৌনকর্মীদের শিশুদের অবস্থা থেকে কোনো অংশে কম নয়। প্রথমত, তাদের যৌন ক্রিয়াকর্ম শুরু করতে হয় শরীর গঠনের অনেক আগে থেকেই। দ্বিতীয়ত, যেহেতু ক্রেতারা শিশু যৌনকর্মীদের বেশি পছন্দ করে সেহেতু তাদের প্রায় ছয় সাত জন ক্রেতাকে একদিনে সঙ্গ দিতে হয়। তৃতীয়ত, তাদের দালাল ও ব্রথেল মালিকরাই সবচেয়ে বেশি শোষণ করে। চতুর্থত, দালাল ও ব্রথেল মালিকদের বিনামূল্যে যৌন চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য এই শিশুরা খুব সহজেই শিকার হয়ে পড়ে। পঞ্চমত, যেহেতু তাদের এই বৃত্তিতে থাকার সময়কাল দীর্ঘ, অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ, সচেতনতা কম সেহেতু তারা খুব সহজেই এস.টি.ডি, এইচ.আই.ভি এবং অন্যান্য যৌন সমস্যার শিকার হয়। ষষ্ঠত,

তারা পরিবারের সদস্যদের দ্বারাও শোষিত হয়। খুব কম ক্ষেত্রেই তারা তাদের আয় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। বেশিরভাগ সময়ই তাদের পরিবারের সমদস্যরা এই আয় নিজেরা নিয়ে যায়।

৬.৮ গণিকাবৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধমূলক কাজ

সামাজিক সমস্যা কখনো বিচ্ছিন্ন নয়। তারা আন্তঃসম্পর্কিত। সামগ্রিকভাবে বিশ্বে গণিকাবৃত্তি একটি উত্তেজক সামাজিক সমস্যা হওয়ায় এর সঙ্গে অন্যান্য সমস্যার আন্তঃসম্পর্ক আছে যার মধ্যে অপরাধমূলক কাজকর্ম একটি। গণিকাবৃত্তি প্রত্যেকের জীবনের, পরিবারের ছন্দকে নষ্ট করে দেয়। এটি স্বাভাবিক যে এই সমস্যা সম্প্রদায়—জীবনকেও নষ্ট করে। এইরকম একটি পরিবেশেই বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম বৃদ্ধি পায়।

অপরাধমূলক কাজকর্ম মূলত তিনটি জিনিসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত—সম্পত্তি, মদিরা ও নারী। নারীকে কেন্দ্র করে বহু অপরাধমূলক কাজকর্ম ঘটে। আন্তর্জাতিক অপরাধমূলক কাজ থেকে শুরু করে সাধারণ ছোটোখাটো অপরাধেও মহিলাদের সরাসরি বা পরোক্ষ যোগদান খুবই সাধারণভাবে ঘটে থাকে। রেডিয়ো, টিভি বা সংবাদপত্র অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে পুলিশের অপরাধের নথি বা গোয়েন্দা দফতরে এ ব্যাপারে অনেক নজির আছে, যেখান থেকে বলা যায় যে গণিকাবৃত্তির সঙ্গে অপরাধী ও অপরাধের সম্পর্ক গভীর। গত কয়েকটি দশকে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.৯ সমস্যার কারণের পেছনে যুক্তি

এমন কোনো সামাজিক সমস্যা নেই যার পেছনে কোনো একটি মাত্র কারণ আছে। অনৈতিক পাচারচক্র বা গণিকাবৃত্তির ক্ষেত্রেও তা সত্যি। অনৈতিক পাচারের পেছনে এই কারণগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে—

(i) অর্থনৈতিক কারণ ঃ বিভিন্ন গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে বেশিরভাগ গণিকারাই দরিদ্র ঘর থেকে আসে। এইসব গবেষণা থেকে আরো দেখা যায় যে এই সব মেয়েরা গণিকাবৃত্তিতে আসে চরম দারিদ্র ও বঞ্চনার ফলে। এস. ভেনুগোপালের মতে গণিকাবৃত্তির প্রধান কারণই অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা। মি. বোঙ্গার, ড. পুণেকর ও শ্রীমতী রাও-ও বলেছেন যে গণিকাবৃত্তির মূলে অর্থনৈতিক উপাদানই থাকে। দারিদ্রের চাপে মেয়েরা অনেক সময়ই স্বইচ্ছায় এই পেশা গ্রহণ করে। অন্যদের

ক্ষেত্রে বাবা-মা/স্বামী/ভাই/আত্মীয় স্বজনের চাপ থাকে যাতে তাদের প্রত্যেকদিন, প্রত্যেক মাসের আয় নিশ্চিত হয়।

(ii) অস্বাস্থ্যকর প্রভাব ঃ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্মিত ছবি, যৌন উত্তেজনাবর্ধক সাহিত্য ও ছবি এবং যৌনোচ্ছ্বাসপূর্ণ কথাবার্তা ব্যক্তির চরিত্রকে প্রভাবিত করে। এসবের মাধ্যমে যৌন বিকৃতির সৃষ্টি হয় কারো কারো মধ্যে, যারা তাদের যৌন চাহিদা যে-কোনো উপায়ে তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। এভাবেই তাদের একটি অংশ গণিকাবৃত্তিতে চলে আসে। শ্রীমতী প্রমিলা কাপুরের গবেষণা থেকে দেখা যায় যে এমন কিছু মহিলা থাকেন যারা ১ ঃ ১ সম্পর্কে সন্তুষ্ট থাকেন না। তাদের যৌনতৃপ্তির জন্য তারা একাধিক পুরুষের সঙ্গ চান। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে অনেকেই এই পেশায় প্রবেশ করেন।

(iii) ধর্মীয় অনুশাসন ঃ দেবদাসী/বাসবী/যোগিনী প্রভৃতি হল ধর্মীয় অনুশাসন মেনে গণিকাবৃত্তিতে প্রবেশের উদাহরণ। দক্ষিণ ভারতে দেবদাসী একটি বহু পুরোনো প্রথা। এক্ষেত্রে কন্যা সন্তানকে খুব অল্প বয়সে দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হয়। এবং পরবর্তীতে তাদের সমাজ আয় গ্রহণ করে না। এর ফলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই গণিকাবৃত্তিতে চলে আসে। যদিও এই প্রথা এখন লুপ্তপ্রায় তবুও এর অস্তিত্ব দেশের কিছু অংশে লক্ষ্য করা যায় যেমন মহারাষ্ট্রে, গোয়া এবং কর্ণাটকে। এই এলাকার মানুষের ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা সংশ্লিষ্ট এলাকার কিছু মেয়েকে তাদের জীবনে কোনো না কোনো সময়ে গণিকাবৃত্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ ছাড়া কিছু উপজাতীর সনাতনী পেশাই গণিকাবৃত্তি। যেমন—রাজস্থানের বেদিয়া, উত্তরপ্রদেশের সাঁসী উপজাতি।

(iv) বিধবা বিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা ঃ খুব অল্প বয়সে বিধবা হলে সামাজিকতার চাপে অনেক মহিলার পক্ষে পুনর্বিবাহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাদের মধ্যে অনেকের পক্ষে যৌন সম্পর্ক ছাড়া জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব হয় না। তাই জৈবিক চাহিদা পূরণে এবং পরিবারের অসহনীয় ব্যবহার এড়াতে কিছু বিধবা বাড়ি ছেড়ে গণিকালয়ে আশ্রয় নেয়।

(v) অপহরণ ঃ কিছু অসামাজিক ব্যক্তির কাছে মেয়ে ও মহিলাদের অপহরণ করে গণিকালয়ে পাঠানোই পেশা। আমরা পুলিশবিভাগ ও প্রত্যেকদিনের সংবাদ পত্র থেকে এই ধরনের ঘটনার অনেক উল্লেখ পাই। বম্বে শহরের গণিকাদের ওপর গবেষণায় ড. পুণেকর এবং অন্যান্যরা দেখিয়েছেন যে বহু সংখ্যক মেয়েদের বাধ্য করা হয়েছে এই পেশা বেছে নিতে। সেন্ট্রাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের কলকাতার গণিকাদের ওপর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৩২.৩% গণিকাদেরই অপহরণের পর এই পেশা নিতে বাধ্য করা হয়েছে।

(vi) মানসিক অসম্পূর্ণতা ঃ ইলিয়ট এবং মেরাল দেখিয়েছেন যে বহু সংখ্যক গণিকারাই মানসিকভাবে অসম্পূর্ণ। তারা বুঝতে পারে না কোন্‌টা ঠিক এবং কোন্‌টা ভুল। যার ফলে তারা অসামাজিক ব্যক্তির অনৈতিকতার খুব সহজ শিকার হয়ে যায় এবং বাধ্য হয় গণিকার জীবন বেছে নিতে। বিশেষত দালালশ্রেণির লোক তাদের খুব সহজেই লোভ দেখিয়ে নানারকম আশ্বাস দিয়ে শেষ পর্যন্ত যৌনকর্মীতে পরিণত করে।

(vii) পারিবারিক কারণ ঃ অসুখী দাম্পত্যজীবন হলে, স্বামী অবিশ্বাসী হলে, স্বামী ছেড়ে চলে গেলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা গণিকাতে পরিণত হয়ে থাকে। গণিকাদের জীবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা স্বামীর সঙ্গে সমঝোতা না করতে পেরে কোনো একটা সময়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে এবং এই পেশা নেয়। কখনো-কখনো তাদের বাড়ি থেকে বার করে দিলে অন্য কোনো উপায় আর না থাকলে তারা এই পেশায় আসে।

(viii) অবৈধ যৌন সম্পর্ক ঃ অনেক অল্পবয়সি মেয়েরা বিশেষ করে কিশোরী বয়সের মেয়েরা শারীরিক ও মানসিকভাবে কোনো পড়শি, আত্মীয়, বন্ধু, পারিবারিক বন্ধু, শিক্ষক, এমনকি গাড়ির চালক বা বাড়ির কর্মচারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কখনো-কখনো তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্কও ঘটে। এমন অনেক মেয়ে এই যৌন সম্পর্ক প্রকাশের সামাজিক ভয়ে গণিকাবৃত্তিকেই পেশা করে ফেলে। এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটে সেইসব মেয়েদের ক্ষেত্রে যেখানে যাদের সঙ্গে তাদের যৌন সম্পর্ক ঘটে তারা এদের পরিত্যাগ করে বা মেয়েটি গর্ভবতী হলে বা অবিবাহিত মা হয়ে পড়লে এমন ঘটে থাকে।

ওপরের কারণগুলি ছাড়াও সহজে যৌন অভিজ্ঞতা পেতে, বিবাহ ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণায়, দুঃসাহসিক কাজের প্রবণতায়, নিম্নমানের নৈতিক মূল্যবোধ থাকলে, যে-কোনো উপায়ে টাকা রোজগার করার দরকার থাকলে, ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেও এই পেশায় মেয়েরা এসে থাকে। সমাজে মেয়েদের নিম্নমর্যাদা, পুরুষশাসিত সমাজ, অল্প বয়সে বৈধব্য, গণিকার সন্তান হওয়ার ফলে সামাজিকভাবে নিন্দনীয় চিহ্নিতকরণের ভয়ে এই সমস্যা ঘটে থাকে।

৬.১০ গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে আইনি ব্যবস্থা

যৌন অপরাধ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার কিছু নিয়ম প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে ইন্ডিয়ান পিনাল কোড

চালু হয় যেখানে মহিলাদের কোনো যৌন সম্পর্কে জোর করে প্রবেশ করানোর বিপক্ষে কিছু নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। এই কোডগুলি হল—

(i) জরিমানা, এক বছর পর্যন্ত জেল বা দুটিই, যদি কোনো মেয়েকে বিরূপ মন্তব্য, অঙ্গাভঙ্গি বা কোনো বস্তুর দ্বারা তার ব্যক্তিগত জীবন/গোপনীয়তা নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। (সেকশন—৩৫৪)

(ii) অপহরণ, জোর করে বিয়ে করা, জোর করে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা, মহিলাদের অনিচ্ছায় অন্যের অস্বাভাবিক লোভের শিকার করা, এমন ব্যক্তিকে জরিমানা ও ১০ বছর পর্যন্ত জেল বা দুটিই হতে পারে। (সেকশন—৩৬৬)

(iii) ১৮ বছরের কম বয়সি কোনো মেয়েকে বিক্রি করা বা ঘিরে রাখলেও সেই ব্যক্তির অনুরূপ শাস্তি হবে। (সেকশন—৩৭২)

(iv) ষোলো বছরের কম বয়সি মেয়ের সঙ্গে তার ইচ্ছা ছাড়া বা ইচ্ছানুযায়ী যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে তার ১০ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। (সেকশন—৩৭৫)

(v) অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে কোনো ব্যক্তির পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। (সেকশন—৪৯৭)

(vi) কোনো বিবাহিতা মহিলাকে বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্কে প্রলুব্ধ করলে বা তার জন্য তাকে আটকে রাখলে সেই অপরাধীর জরিমানা ও দু-বছর পর্যন্ত জেল বা দুটিই হতে পারে। (সেকশন—৪৯৮)

স্বাধীনতার আগে এবং পরে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার গণিকাবৃত্তি রুখতে কিছু আইন গঠন করেন। এগুলি হল—

★ বোম্বে প্রিভেনশন অফ প্রস্টিটিউশন অ্যাক্ট ১৯৩২

★ মাদ্রাজ প্রিভেনশন অফ প্রস্টিটিউশন অ্যাক্ট ১৯৩০

★ বেঙ্গল প্রিভেনশন অফ প্রস্টিটিউশন অ্যাক্ট ১৯৩৩

★ ইউ. পি প্রিভেনশন অফ প্রস্টিটিউশন অ্যাক্ট ১৯৩৩

★ পাঞ্জাব প্রিভেনশন অফ প্রস্টিটিউশন অ্যাক্ট ১৯৩৫

★ বিহার প্রিভেনশন অফ প্রস্টিটিউশন অ্যাক্ট ১৯৪৮

★ এম.পি. প্রিভেনশন অফ প্রস্টিটিউশন অ্যাক্ট ১৯৫৩

রাজ্যের গণিকাবৃত্তি প্রতিরোধ আইনে কিছু পার্থক্য আছে। কিছু বিশেষ আইনও গঠন করা হয় যেমন—

★ ইউ পি গার্লস প্রোটেকশন অ্যাক্ট ১৯২৯

★ বোম্বে দেবদাসী প্রোটেকশন অ্যাক্ট ১৯৩৪

★ মাদ্রাজ দেবদাসী অ্যাক্ট ১৯৪৭

ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে সাপ্রেশন অফ ইম্‌মরাল ট্রাফিক অ্যাক্ট গঠন করেন। এটিকে ১৯৮০-তে সংশোধন করা হয় এবং ২০০৬-তে পুনর্বার সংশোধন করা হয়। এটি একটি শক্ত আইনে পরিণত হয়েছে। এটি লোকসভায় গৃহীত হলে কোনো গণিকালয়ে যাওয়া বা কোনো যৌন কার্যালয়ে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণিকাবৃত্তি কিছু কিছু জায়গায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে তবে ওই দেশে তাদের কিছু সামাজিক সুবিধাও দেওয়া হয়ে থাকে। অন্যান্য বহু দেশে তা বৈধও ঘোষণা করা হয়েছে হয়তো ভারতকে এই পরিস্থিতিতে কোনো একটি সমাধান খুঁজতে হবে যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধকরণের মাঝামাঝি একটি আর্থসামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক বিবেচিত হবে।

৬.১১ সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হস্তক্ষেপ

সমাজের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করার মতো এমনই একটি সমস্যা এই গণিকাবৃত্তি। এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব জুড়ে চিন্তাভাবনা চলছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই বিষয়ে তৎপরতা দেখিয়েছে। যার ফলে প্রায় অনেক দেশই এ বিষয়ে কিছু না কিছু নীতি নির্ধারণ করেছে। আমাদের সরকার যে নীতিভিত্তিক কার্যপ্রক্রিয়া শুরু করেছে তা নিম্নরূপ ঃ

(i) আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমস্যাটির মোকাবিলা করা। সময়ের সঙ্গে এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আইনের সংশোধন করা।

(ii) বিষয়টির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য প্রত্যেকটি রাজ্য তৎপরতার সঙ্গে বিষয়টিকে নিয়ে ভাববে সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(iii) গণিকালয়গুলিকে এবং সেখানকার বাসিন্দাদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে যাতে যে কেউ ইচ্ছামতো এই পেশায় অংশগ্রহণ করতে না পারে।

(iv) সরকারি হাসপাতালে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

(v) গণিকাবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষেত্রে সরকার পরিত্রাতা কেন্দ্র, সংরক্ষণশীল কেন্দ্র ইত্যাদি চালু করেছে।

(vi) সেন্ট্রাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড, স্টেট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাডভাইজারি বোর্ড, সোশ্যাল অ্যান্ড মোরাল হাইজিন্ এজেন্সি প্রভৃতি গঠন ও সোশ্যাল অ্যান্ড মোরাল হাইজিন-এর অ্যাডভাইসারি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(viii) হোটেল, লজ, গেস্টহাউস, পার্লার, ডান্সবার প্রভৃতিতে সময়ে সময়ে রেইড করা।

সরকার নারী ও শিশু পাচার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। পাচারের পর যৌন শোষণ, বাণিজ্যিকভাবে যৌনতাকে ব্যবহার করা নারী ও শিশুর অধিকার লঙ্ঘনের একটি জঘন্যতম কাজ। সুতরাং জনসমাজে এইসব শিশুদের উদ্ধার করে তাদের পুনর্বাসন অত্যন্ত জরুরি বলে সরকার মনে করে। এই নারী ও শিশু পাচাররোধে ইম্‌মর‍্যাল ট্রাফিক (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট ১৯৮৬ চালু হয়েছে যা ১৯৫৬ সালে গৃহীত SIT Act-এর একটি রূপবিশেষ।

এ ছাড়া, উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট দফতর একটি ভারতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ১৯৯৮-তে যার উদ্দেশ্য হল বাণিজ্যিক কারণে যৌন শোষণের শিকারদের পুনঃঐক্যবদ্ধ করা। এদের মূল উদ্দেশ্য হল—

- পাচার রোধ করা
- সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও সুসংহত করা
- স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদান
- শিক্ষা ও শিশুর পরিচর্যা প্রদান
- গৃহনির্মাণ
- মাথার ওপর ছাদ ও সামাজিক সুযোগসুবিধা প্রদান
- অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন
- আইনি সংশোধন
- উদ্ধার ও পুনর্বাসন

এই দফতর একটি কমিটি গঠন করেছে যার নাম সেন্ট্রাল অ্যাডভাইজারি কমিটি (সি.এ.সি.) যার চেয়ারম্যান হলেন ওই দফতরের সম্পাদক। এই কমিটির সদস্যরা হলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন

মন্ত্রীরা। বেশিরভাগ রাজ্য সরকার স্টেট অ্যাডভাইজারি কমিটি গঠন করেছে যার চেয়ারম্যান হলেন চিফ সেক্রেটারি বা অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি।

গত কয়েকবছরে যে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল—

(১) সমস্ত নির্বাচিত মহিলা LSG প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সচেতন করা যাতে পাচারকারীরা সহজে সরল মেয়েদের তাদের শিকার করতে না পারে।

(২) আন্তর্জাতিক পাচার রুখতে কী কী উপায় অবলম্বন করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ওই দফতর একটি কমিটি গঠন করেছে। ওই কমিটির আরো একটি উদ্দেশ্য হল পাচারিকৃত মহিলা ও শিশুদের কীভাবে উদ্ধার, পুনর্বাসন ও পাচার বন্ধ করা যায় সে বিষয়ে বিভিন্ন উপায় অনুসন্ধান করা।

(৩) সমস্যা মোকাবিলায় নানা ধরনের কর্মসূচি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং এই কর্মধারায় সুসংহতি বজায় রাখা।

(৪) ইউনিসেফের ভারতীয় অফিসের সঙ্গে সংযুক্তিতে কিছু ক্রোড়পত্র তৈরি করা যাতে সাধারণ সচেতনতা গড়ে ওঠে।

(৫) অনেকগুলি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কতগুলি কর্মসূচির খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে।

(৬) উপকূল অঞ্চল এবং বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে সমীক্ষা চালানো।

(৭) শিশুদের ওপর যৌন অত্যাচার রোধে সুসংহত আইন প্রণয়নের চেষ্টা চালানো।

(৮) জনমানসে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

(৯) আই.টি.পি.এ.—১৯৫৬-র পরিধি বাড়ানোর জন্য প্রক্রিয়াগত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে দফতরটি।

কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এ ব্যাপারে, কলকাতায় প্রায় তিন ডজন এমন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে যাদের কার্যপ্রক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঃ

(i) গণিকা ও তাদের শিশুদের স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদান।

(ii) প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা, এস. টি. ডি./এই. আই. ভি এবং অন্যান্য যৌন রোগ, সেফ সেক্স সম্বন্ধে প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো।

(iii) গণিকাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মাথার ওপর ছাদ দেওয়ার প্রচেষ্টা করা।

(iv) গণিকালয়ের মালিক, পুলিশ ও দালালদের দ্বারা যাতে গণিকারা শোষিত ও বিরক্ত না হয় তা দেখা।

(v) গণিকা এবং তাদের সন্তানদের জন্য কারিগরি শিক্ষার আয়োজন করা।

(vi) কনডোম বিতরণ করা।

(vii) সমস্যাটির বিভিন্ন দিক নিয়ে সমীক্ষা চালানো।

(viii) স্বনির্ভরগোষ্ঠী গঠন ও তা পরিচালনা করা।

সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ-এর মধ্যেই এই ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া আরো অনেক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন আছে। ১৯৫০ সালে নিউইয়র্কে এস.আই.টি-র ইউ. এনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার এস. আই. টি. অ্যাক্ট চালু করেছে। তবে দেশের সর্বত্র এই আইন সমানভাবে কার্যকর করা যায়নি। যেমন— এই অ্যাক্টের ১৩নং সেকশনে বলা আছে যে রাজ্য সরকার এই সমস্যার সমাধানের উপায় হিসাবে একটি অ্যাডভাইজারি কমিটি গঠন করবে। কিন্তু এমন ধরনের কমিটির অস্তিত্ব প্রায় কোনো পক্ষেই নেই। এই অ্যাক্টে আরও বলা আছে যে প্রতিরোধক ও পুনর্বাসন সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যা নিম্নবর্তী সমস্যাগুলোর জন্য আজও কার্যকর হয়নি—

★ এমন হোমের সংখ্যা খুব কম

★ অপ্রতুল পরিকাঠামোগত সুবিধা

★ কর্মচারীদের নিম্নমান

★ অপ্রতুল প্রতিপালন ও তদারকি ব্যবস্থা

এ ছাড়াও এই সমস্যা সমাধানে একটি বড়ো বাধা হল যে পুলিশ ও প্রশাসন খুব কমই মালিক, ব্রথেল ম্যানেজার, দালাল ও ক্লায়েন্টদের নামে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে। এই পরিস্থিতিতে সরকার এবং বেসরকারি সংস্থার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস দরকার যাতে এই সমস্যার সমাধান করা যায় সুস্থ সামাজিক জীবনের স্বার্থে।

৬.১২ অনুশীলনী

(১) গণিকাবৃত্তির সংজ্ঞা দাও এবং এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(২) গণিকাবৃত্তির কারণের পেছনে সম্ভাব্য যুক্তিগুলি কী কী?

(৩) যৌনকর্মীর সন্তানদের দুর্দশা এবং তাদের উন্নয়নকল্পে সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করুন।

৬.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

(1) দি আন অ্যাডজাস্টেড গার্ল ঃ ডব্লু. আই. টমাস

(2) সোশ্যাল ডিস অরগ্যানাইজেশন ঃ ইলিয়ট ও মেরিল

(3) এ স্টাডি অফ দি প্রস্টিটিউটস ইন বোম্বে ঃ এস. ভি. পুণেকার ও কমলা রাও

(4) দি সোশিওলজি অফ প্রস্টিটিউশন ঃ কিংসলে ডেভিস

(5) প্রস্টিটিউশন ইন হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড মডার্ন পারসপেকটিভ ঃ বিশ্বনাথ জানা

একক ৭ ❑ বিশেষ যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এমন শিশুদের সমস্যা

গঠন

৭.১ ভূমিকা

৭.২ শ্রেণিবিভাগ

৭.৩ সমস্যার প্রকৃতি

৭.৪ কারণসমূহ

৭.৫ বিস্তৃতি ও প্রসার

৭.৬ প্রতিরোধ

৭.৭ অনুশীলনী

৭.১ ভূমিকা

যে-কোনো দেশের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ হল শিশু। তারাই সমাজের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কারণ তারা সহজে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়ে। ভারতীয় সংবিধানে বলা হয়েছে যে দেশের শিশুদের রক্ষা ও লালনপালন দরকার যাতে তারা ভবিষ্যতে ব্যবহার্য নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

১৯৯১-এর জনগণনায় দেখা গেছে যে ১৯ বছরর কম বয়সি শিশুর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ৩,৩৫,৬২,৪৩৬, যা প্রায় রাজ্যের সমগ্র জনসাধারণের প্রায় অর্ধেক (৬,৭৯,৮২,৭৩২) সেজন্য সমাজের উচিত এমন বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা যা তাদের বেঁচে থাকা, বৃদ্ধি ও সুরক্ষা দিতে পারে এবং যেখানে তারা তাদের দেয় সুযোগগুলি ব্যবহার করতে পারে। এই ধরনের পরিবেশ প্রদান করাই সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

অনেক কারণের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক শিশুর খারাপ স্বাস্থ্য (পুষ্টিকর খাবারও তার অন্তর্গত), স্কুলে যাওয়ার সুযোগের অভাব, নানা ধরনের অত্যাচার, বৈষম্য ও শোষণের শিকার হয়। এই ধরনের শিশুরা এমন পরিবেশে বেড়ে ওঠে যে তাদের পক্ষে তাদের সম্পূর্ণ যোগ্যতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়

না। এই ধরনের ক্ষেত্রে তারা তাদের অধিকারগুলির থেকেও বঞ্চিত হয় এবং সমাজের উন্নয়নও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সুতরাং এটা জরুরি যে সমাজের সব স্তরের মানুষ বিশেষ করে তারা, যারা শিশুদের সংস্পর্শে দৈনন্দিন জীবনে আসেন, যেন শিশুর অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। বিশেষ করে সেইসব শিশুদের ক্ষেত্রে যারা অর্থনীতিক অস্বাচ্ছন্দের মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠে।

৭.২ শ্রেণিবিভাগ

(i) সেইসব শিশুর যাদের পিতা-মাতা বা অন্য কোনো আত্মীয় নেই বা যারা অনাথ।

(ii) এক পিতা-মাতা পরিবারে (Single Parent Family) যেসব শিশুরা থাকে যেখানে হয় পিতার মৃত্যু হয়েছে বা তিনি তার পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন অথবা তদ্বিপরীতভাবে পরিত্যক্ত শ্রেণির অন্তর্গত যারা।

(iii) মানসিক রোগ বা কুষ্ঠরোগের জন্য যেসব পিতামাতা তাদের সন্তানের লালনপালন করতে পারেন না।

(iv) যেসব শিশুরা এমন কম আয়সম্পন্ন পরিবারে জন্মেছে যারা ঠিকমতো দু-বেলা খেতে পারে না।

(v) যৌনকর্মী মায়ের সন্তান যেসব শিশুরা।

(vi) ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প ও কারখানায় যে শ্রমিকরা কাজ করেন তাদের সন্তানরা।

(vii) যে শিশুদের রাস্তায় জন্ম বা যারা রাস্তাতেই বড়ো হয়ে উঠছে।

(viii) কাগজ কুড়ানি হিসাবে যেসব শিশুরা কাজ করে।

(ix) সেইসব মায়ের সন্তান যারা অন্যের বাড়িতে কাজ করে এবং শিশুরা মায়ের কাজের সময় বস্তিতে বা তার আশেপাশে অযত্নে থাকে।

(x) শিশুর পাচারচক্রের শিকার বা যৌন অত্যাচারের শিকার যেসব শিশুরা বা যারা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে।

(xi) সেইসব শিশুরা যাদের AIDS/HIV হয়েছে বা যারা মাদকাসক্ত।

(xii) সেইসব শিশুরা যারা থ্যালাসেমিয়া বা ক্যানসার ইত্যাদি রোগে ভোগে, যে রোগের চিকিৎসা খরচ খুব বেশি।

(xiii) সন্ত্রাসবাদী হামলা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেসব শিশু ক্ষতিগ্রস্ত তারা।

(xiv) আকস্মিকভাবে বা জন্ম থেকেই যেসব শিশুর শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আছে।

(xv) যেসব শিশুরা বিচ্যুতি ঘটিয়েছে এবং যাদের সংস্কার প্রয়োজন।

(xvi) ভেঙে যাওয়া পরিবারে যেসব শিশু দেখা যায়।

(xvii) অসামাজিক কাজকর্মে যেসব শিশুকে পাওয়া যায় যেমন—চুরি, মাদক পাচার, শিশু পাচার ইত্যাদি।

(xviii) মানসিকভাবে যে সব শিশু মানিয়ে নিতে পারে না।

৭.৩ সমস্যার প্রকৃতি

রাস্তায় বেড়ে ওঠা শিশু ও শিশুকর্মীদের সমস্যা অতীতেও ছিল কিন্তু ষাটের দশক থেকে এই সমস্যা আরো জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গ্রামীণ এলাকা ও আদিবাসী এলাকা থেকে চলে আসা পরিবারগুলি শিল্প নির্ভর এলাকায় অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পায়। এই পরিবারগুলি তাদের কাজের ক্ষেত্রের কাছাকাছি এলাকায় স্থায়ীভাবে থাকে। কখনো বা কোনো ব্রিজের তলায়, কোনো পাইপের ভেতরে, ফুটপাতে এইসব পরিবারগুলি থাকে। এই পরিবারগুলির শিশুদের কোনো শৈশব থাকে না, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকেও তারা বঞ্চিত থাকে, শৈশবে বাবা-মায়ের যত্নের অভাবে তাদের দিনের মধ্যে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা রাস্তাতেই দেখা যায়।

আগে উল্লিখিত সমস্ত শিশুদেরই সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ হয় এবং নীচে একটি তালিকায় তাদের সাধারণ কিছু সমস্যা আলোচনা করা হল—

(১) তারা বেশিরভাগই দরিদ্র পরিবারের যারা দু-বেলা ভালো করে খেতে না পাওয়ায় অপুষ্টির শিকার।

(২) শিক্ষার সুযোগ নেই বা খুব কম।

(৩) বাবা-মায়ের দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার।

(৪) রাস্তায় বা কাজের ক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের শিকার।

(৫) যে-কোনো ধরনের রোগের শিকার হয় তাড়াতাড়ি এবং মাদক, মদ বা ধূমপানের মতো নেশার শিকার।

(৬) কোনো সৃষ্টিশীল কাজ, খেলাধুলার মাধ্যমে বিনোদন ব্যবস্থা নেই।

(৭) স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় না বা কোনো প্রতিষেধক গ্রহণ করে না।

(৮) সামাজিক কাজকর্মে খুব সহজেই জড়িয়ে পড়ে যারা তাদের ভিখারি, মাদক চালানকারী, ইত্যাদি হিসাবে ব্যবহার করে।

(৯) গ্রামীণ এলাকা থেকে চলে আসা বা বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা ছেলেরা সহজেই পাচারচক্রের শিকার হয় এবং মেয়েদের দেহব্যবসায় নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

(১০) এই শিশুদের মধ্যে HIV/AIDS-র সংক্রমণের সুযোগ বেশি হয়।

৭.৪ কারণসমূহ

ব্যাপক নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে নিঃস্ব মানুষের সমস্যা বেশিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সমস্যাটি ক্রমশই বাড়ছে। বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে তাদের পরিবারগুলির প্রব্রজনের ফলে তারা বাধ্য হচ্ছে বস্তি এলাকায়, বা রাস্তায় থাকতে। এর ফলে আবারও তাদের নিঃস্ব অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে এবং কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পক্ষেত্র ও শহরে কিশোর ভিখারির সংখ্যাবৃদ্ধি থেকেই বোঝা যায় নিঃস্ব মানুষের বৃহত্তর সমস্যা সমাজে কতটা।

দেশের অর্থনীতিক অবস্থায় অনেক পরিবার বাধ্য হয়ে প্রত্যেকটি সদস্যকে কাজে যোগ দিতে বিশেষ করে সেসব ক্ষেত্রে যেখানে শিশুরা নির্ভরশীল। এইসব শিশুরা নিজেরা ঘুরে বেড়ায় বা পড়শিদের সঙ্গে থাকে বা তাদের থেকে বেশি বয়সের ছেলেদের সঙ্গে থাকতে বাধ্য হয়। এই শিশুরা অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে যেগুলি ওই পরিবেশে ঘটে থাকে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের ফলে এইসব পরিবারের শিশুরা অস্বাস্থ্য, অপুষ্টি, শিক্ষার অভাবে ভুগতে থাকে। এদের মধ্যে অস্বাভাবিকতা গড়ে ওঠে এবং এমন কিছু বিকল্প কাজে এরা জড়িয়ে পড়ে যার মাধ্যমে তারা চেষ্টা করে সমাজের মূল ধারায় চলে আসতে।

যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ায়, সনাতনী নৈতিক মূল্যবোধ ভেঙে পড়ায়, অনুপরিবারগুলি স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু এই ভাঙনের একটি পার্শ্ববর্তী প্রভাব হল স্বামীর স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যাওয়া, পুনর্বিবাহ

আবার কখনো-কখনো স্বামীর হাতে স্ত্রীর বিক্রি হয়ে যাওয়া। আবার এই পরিবারগুলি এমন জায়গায় প্রব্রজনের ফলে চলে যায়, যেখানে সবসময় আত্মীয়দের সঙ্গে সংস্পর্শ রাখা কঠিন, যেখানে স্বামীর দুরভিসন্ধি ফলপ্রসূ করা আরো সহজ হয়ে ওঠে। এসবের মাঝে শিশুদেরই সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ হয়।

আধুনিকীকরণ ও পশ্চিমিকরণের খারাপ প্রভাবেও কিছু শিশুর জীবন অনিশ্চিত হয়ে যায়। ভোগবাদের বৃদ্ধির ফলে, গণমাধ্যমের বৃদ্ধির ফলে দেশের দুর্গম স্থানেও মানুষ টাকার পেছনে ছুটে চলেছে। অনেক দূরবর্তী গ্রামের মেয়েরাও পাচার হয়ে যাচ্ছে ভালো থাক এবং কর্মসংস্থানের লোভে। এরা কখনোই এদের ঈপ্সিত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছে না।

শিশুদের অবস্থা প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় এই পরিস্থিতিতে বেশি সঙ্গীণ কারণ—

(১) কারণ ও ফলাফলের বোধ কম।

(২) কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রভাব এদের ওপর বেশি।

(৩) পরিপক্কতার অভাবে কোনো জটিল সমস্যাকে মোকাবিলা করার দক্ষতা কম।

(৪) মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা কম।

(৫) প্রতিরোধ ক্ষমতা কম।

(৬) প্রতিদিনের কাজে বিঘ্ন ঘটলে তা মোকাবিলা করা কঠিন।

(৭) স্বাভাবিক জীবনে আগামী বিঘ্ন অনুমান করা সহজ নয়।

(৮) পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত চাপ নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

(৯) নানা ধরনের ভয় ও চাপের মধ্যে এরা থাকে। যেমন—আবার কোনো দুর্ঘটনা ঘটা, আঘাত পাওয়া, কোনো আত্মীয় বিয়োগ, একাকীত্ব, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি।

৭.৫ বিস্তৃতি ও প্রসার

বিশ্বে যে-কোনো শিশুই সরল, নির্ভরশীল, কৌতূহলী, সক্রিয়, আশাবাদী এবং সহজেই কোনো নির্যাতনের শিকার হয়। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ শিশু নানা বিপদের মধ্যে পড়ে, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক সংকট ভোগ করে। ফলত ক্ষুধা, বাড়িছাড়া, মহামারী, অশিক্ষার ক্রমশ বৃদ্ধি ঘটে। লক্ষ লক্ষ শিশু অনাথ হয়। রাস্তায় বেড়ে ওঠা শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে কখনও বেঁচে থাকার জন্য অপরাধমূলক কাজ করে। এমনকি শিশু শ্রমিকরা দেহব্যাবসা, যৌন নিপীড়নের শিকার হয়, HIV-এর দ্বারা আক্রান্ত হয় বা অন্য ধরনের শোষণেরও শিকার হয়।

জার্মানে, ভারতে শিশু মৃত্যুহার হল ১০০০ জন্মপিছু ৭০। কন্যা শিশুদের মধ্যে শিশু মৃত্যুহার এখনও সবচেয়ে বেশি। তিন মিলিয়ন শিশু এখনও রাস্তায় বেড়ে ওঠে। ১১১ মিলিয়ন শিশু শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। এর ফলে একটা বিরাট অংশ এখনও স্কুলে ঢোকেনি। (উৎস CRY)।

পশ্চিমবঙ্গে শিশুদের মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী ১.৮%, অর্থপেডিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক, ৩০% কানে শোনে না, ২০% চোখে দেখে না। ০-১৪ বছর বয়সি শিশুদের মধ্যে ১৫ মিলিয়নের লোকোমোটর ডিস্‌এবিলিটি আছে। ৬৭৬ মিলিয়ন গ্রামীণ এলাকায় থাকে ৪৩১ মিলিয়ন শহরে থাকে। এদের বেশিরভাগই থাকে পশ্চিমবঙ্গে।

৭.৬ প্রতিরোধক

স্বাস্থ্য ঃ দি ইউনিভার্সাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম (ইউ. আই. পি) একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে তারা সমস্ত মা ও শিশুর বিশেষ করে গর্ভবতী মা ও কোলের শিশুর কাছে পৌঁছাবে যাতে তারা তাদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।

(১) পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর নিয়মিত প্রতিষেধক গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে প্রত্যেকটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, যাতে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষও এই পরিষেবার সুযোগ পায়। বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে দরিদ্র এলাকাগুলিতে।

(২) হাম প্রতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, ভিটামিন-এর ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং কতজন এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে তার সংখ্যাও গোনা হচ্ছে।

(৩) এই রাজ্যে পোলিও রোগ ক্রমশ কমছে। ১৯৯০-এ ৮৮৬ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪৭৩-এ ১৯৯২-তে। কেন্দ্রীয় সরকার, কল্যাণমূলক সংগঠন ইত্যাদি ৫ বছরের কম বয়সি শিশুকে পোলিও খাওয়ানোর ব্যাপারে যথেষ্ট সক্রিয় হয়েছেন।

(৪) শিশুর জন্মের পর টিটেনাস ইনজেকশন গ্রহণে সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে শিশু মৃত্যুহার রোধ করা যায়।

(৫) ডায়েরিয়ার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৭০% কমানো গেছে বিশেষ করে ৫ বছরের কম বয়সি শিশুর ক্ষেত্রে। ও.আর.এস. খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বিভিন্ন হাসপাতালে। মৃত্যুহার (Mortality) এবং রোগগ্রস্ততা (morbidity) কমানোর জন্য ইনটিগ্রেটেড কনট্রোল অফ ডায়োরয়্যাল

ডিজিজেজ (Integrated control of Diarrhoeal Diseases) এবং জল ও শৌচাগার (Water and sanitation) (CDD-WATSAN) ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।

(৬) HIV/AIDS-এ আক্রান্ত শিশুদের চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে তাদের চিকিৎসারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনা গড়ে তোলার জন্য নানান প্রকাশনা ইত্যাদির সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে। অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পুনর্স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে AIDS আক্রান্ত রোগীদের বাসস্থান, ওষুধ ও সাহায্য দেওয়ার চেষ্টা করছে।

জল ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা ঃ

জল ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা হল প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিসেবার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। সরকারের পক্ষ থেকে সব সম্প্রদায়ের শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্যব্যবস্থা ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। CAPART একটি সরকারি লগ্নিকারী সংস্থা যারা গ্রামীণ এলাকায় স্বল্প খরচে শৌচাগার নির্মাণ ও টিউবওয়েল তৈরির জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে অর্থদান করে থাকে। জওহর রোজগার যোজনার (JRY) মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষেত্রে প্রত্যেক বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ করার কাজ হচ্ছে। এ ছাড়া ইন্দিরা আবাস যোজনার অন্তর্গত পরিসেবার মাধ্যমে ধোঁয়াহীন চুলা তৈরির কাজ হচ্ছে।

শিক্ষা ঃ

(১) শিক্ষাদফতর স্কুলে ভর্তির তালিকা, শিশুদের স্কুলে টিকিয়ে রাখা, ন্যূনতম শিক্ষার ব্যবস্থা, অনৈক্য দূরীকরণের চেষ্টা, প্রাথমিক শিক্ষার বিশ্বজনীনতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছে।

(২) স্বাক্ষরতা অভিযানের ফলে, শিক্ষার সুবিধা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তা ছাড়া অর্থনৈতিকভাবে বৃদ্ধিশীল অবস্থাতে শিক্ষার চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ছয় থেকে পাঁচ বছর বয়সে ন্যূনতম বয়সসীমা হ্রাস হওয়ার ফলে বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত শিশুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৪) অবৈতনিক শিক্ষা, বিনামূল্যে পাঠ্যবই, স্কুলড্রেস, মিডডে মিল ইত্যাদির ব্যবস্থা সরকার করেছে। এই উদ্দীপকসমূহ তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত পরিবারের কন্যা-শিশুদের স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে।

(৫) তপশিলি জাতি ও উপজাতি দফতর দরিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভাতা দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু করেছে।

(৬) রাস্তার শিশুদের জন্য, বস্তিবাসী শিশুদের জন্য প্রকল্প, শিক্ষালয় প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পুষ্টি ঃ

(i) অপুষ্টিজনিত সমস্যার অনেক উৎস আছে। যেমন—অপর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ, সীমিত ক্রয়ক্ষমতা, খারাপ স্বাস্থ্য, পুষ্টি সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞান।

(ii) পুষ্টিসাধনে গৃহীত কার্যপ্রক্রিয়ার সাফল্য নির্ভর করে আন্তর্বিভাগীয় যোগাযোগ ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের ওপর।

(iii) সম্পূরক খাদ্যগ্রহণ, বৃদ্ধির পর্যবেক্ষণ এবং ICD প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাক্ বিদ্যালয় উপযুক্ত শিশুদের তুলে ধরার প্রকল্প সমস্ত ব্লকস্তরে গ্রহণ করা হয়েছে।

(iv) সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিশুর জন্য মিডডে মিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(v) সমস্ত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রকল্পে প্রত্যেকটি সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কল্যাণমূলক পরিসেবার মধ্যে শিশুদের টিফিন ও মিল প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

(vi) ভিটামিন-এর অভাবজনিত রোগের কারণে অন্ধত্ব প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরীক্ষা করা হয়।

(vii) প্রত্যেক মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন করা যার মাধ্যমে অন্তত ছ-মাস অবধি যাতে শিশুর নিরাপত্তা (immunization) দেওয়া হচ্ছে।

(viii) ICD প্রকল্পের মধ্য দিয়ে রাজ্যের প্রাক্ বিদ্যালয় যাওয়া শিশুর স্বাস্থ্যকে নিয়মিত দেখাশোনা (monitoring) করা হচ্ছে।

অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজকর্ম ঃ

(i) আইনি দ্বন্দ্বে যেসব শিশুরা জড়িয়ে আছে, রাষ্ট্র তাদের বসবাসের জন্য সরকারি সংস্কারমূলককেন্দ্রে শিক্ষা, পুষ্টি, আমোদপ্রমোদ ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করেছে।

(ii) সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিকলাঙ্গ শিশুদের বিকাশের জন্য পুষ্টি ও বিশেষ স্কুল, বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকের ব্যবস্থা করেছে।

(iii) নিষিদ্ধ পল্লির শিশুদের শিক্ষা ও পুষ্টির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, বিশেষত কন্যা শিশুদের ক্ষেত্রে যাতে তারা সংরক্ষিত পরিবেশে থাকতে পারে।

(iv) মাদকাসক্ত শিশুদের জন্য মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে তারা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে। এমনকি ওইসব কেন্দ্রে তারা থেকেও চিকিৎসা করাতে যাতে পারে তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

(v) দুস্থ ও অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্য সাহায্য, সুরক্ষা ও বাসস্থানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে তাদের কোনোরকম নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

৭.৭ অনুশীলনী

(১) কোন্ কোন্ ধরনের শিশুদের সুরক্ষা ও সাহায্যের প্রয়োজন আছে?

(২) শিশুদের সমস্যার বিস্তৃতি ও প্রসার কতটা?

(৩) বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সরকারি তরফে শিশুদের সমস্যার মোকাবিলার কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

একক ৮ ❑ দারিদ্র্য

গঠন

৮.১ ধারণা

৮.২ দারিদ্র্যের প্রকাশ

৮.৩ দৃষ্টান্ত এবং পরিমাপ

৮.৪ দারিদ্র্যের কারণ

৮.৫ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে গৃহীত কৌশল

৮.৬ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি

৮.৭ অনুশীলনী

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ ধারণা (Concept of Poverty)

দারিদ্র্য বলতে এমন একটি সামাজিক অবস্থাকে বোঝায়, যেখানে সমাজের একাংশ তাদের জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম ভোগ্য প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম ব্যাপক অর্থে দারিদ্র্য বলতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বস্তুগত প্রয়োজন মেটানোর অক্ষমতাকে বোঝায়। যখন কোনো দেশের বেশিরভাগ জনগণ, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম প্রয়োজন খাদ্যদ্রব্য পোশাকপরিচ্ছদ, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তখন সেই দেশকে দরিদ্র দেশ বলে আখ্যা দেওয়া যায়। বিশ্বের তৃতীয় সারির দেশগুলির অনেক দেশই ব্যাপক দারিদ্র্য কবলিত। যদিও বেশ কিছু উন্নত দেশেরও কিছু কিছু অংশে দারিদ্র্য লক্ষ করা যায়।

প্রায় সব দেশই দারিদ্র্যের সংজ্ঞা খাড়া করার চেষ্টা করেছে, তাই দারিদ্র্যের ধারণাটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। যেমন—আমেরিকার একজন দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান ভারতের একজন দরিদ্রের মতো নয়, এমনকি মধ্যবিত্ত মানুষের থেকেও উচ্চতর হতে পারে। আমাদের দেশে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে যুক্তিসংগত জীবনযাত্রার মানের থেকে ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

দারিদ্রকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—চরম ও আপেক্ষিক দারিদ্র্য। চরম দারিদ্র্য বলতে এমন অবস্থাকে বোঝানো হয় যখন কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব থাকে। অন্যদিকে আপেক্ষিক দারিদ্র্য হল অন্যের তুলনায় দারিদ্র্যের পরিমাপ। এই ধরনের দারিদ্র্য উন্নত দেশেও লক্ষ করা যায়।

৮.২ দারিদ্র্যের প্রকাশ

কোনো দেশের মোট জনগণের মধ্যে কাদেরকে দরিদ্র বলা হবে, কত শতাংশ লোক দরিদ্র সেই বিষয়ে নানারকম হিসাব এবং ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। তা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে এর হিসাবও ভিন্ন প্রকৃতির। তবে দারিদ্র্যের পরিমাপের জন্য দারিদ্র্যসীমার (Poverty line) ধারণাটি ব্যবহার করা হয়। এখন প্রশ্ন হল দারিদ্র্যসীমা কাকে বলা হয়।

দারিদ্র্যসীমা ঃ দারিদ্র্য সম্পর্কে দু-ধরনের ধারণা দেখতে পাই। একটি হল নিম্নতম মান (Minimum level) এবং অপরটি হল কাঙ্ক্ষিত মান (Desired level)। আমরা নিম্নতম মানের ধারণাটিই ব্যবহার করি। কারণ, আমাদের পরিকল্পনার প্রথম লক্ষ্য হল নিম্নতম মানে পৌঁছানো। এ বিষয়ে নানা সময়ে নানা হিসাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সেগুলির ভিত্তিতে যে মূল বিষয়বস্তুটি পাওয়া যায় সেটি হল বেঁচে থাকার জন্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে কিছু পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করতে হবে। যেসব দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করে একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি দৈনিক ২২৫০ ক্যালোরি তাপশক্তি পেতে পারে, সেই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীকেই নিম্নতম মান হিসাবে ধরা হয়। সেই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে যে ব্যয় হয়, সেটিই হল নিম্নতম ভোগব্যয়। অর্থাৎ এটিই হল দারিদ্র্যসীমা।

যেসব ব্যক্তি এই পরিমাণ ভোগব্যয় করতে পারে না তাদের বলা হয় দরিদ্র, আর যাদের ভোগব্যয় এই সীমার থেকে বেশি তারা দারিদ্র্যসীমার ওপরে অবস্থান করে। ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যস্তর অনুযায়ী যেসব ব্যক্তির মাসিক ভোগব্যয় ২০ টাকার কম, তাদের দারিদ্র্যসীমার নীচে ধরা হয়।

ক্যালোরির মাধ্যমে দারিদ্র্য পরিমাপকে জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি (Biological Approach) বলা হয়। অনেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন না। তাদের বক্তব্য বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেদের ক্যালোরির প্রয়োজন একরকম নয়। তা ছাড়া খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অনেক জিনিস রয়েছে যেগুলি জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের অন্তর্গত, সেগুলি এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়নি।

আয়-বণ্টনে বৈষম্য ঃ কোনো একটি দেশের দারিদ্র্যের মাত্রা বুঝতে হলে, অবশ্যই ব্যক্তিগত আয়-বণ্টনে বৈষম্য সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক প্রদত্ত রাশি তথ্য থেকে জানতে পারি যে, নিম্নের ২০ শতাংশ জনগণ মোট আয়ের ৯% ভোগ করে, যেখানে ওপরের ৫% জনগণ ১৭% মোট আয় ভোগ করে। তা ছাড়া ওপরের অর্ধেক জনগণ মোট আয়ের ৬৯% এবং নিম্নের অর্ধেক ৩১% ভোগ করে। সংযুক্ত তালিকা থেকে আয়-বণ্টনে বৈষম্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

আয়-বণ্টনে বৈষম্য

উৎস ঃ সৌজন্যে Dull & Sundharam

শতাংশের বিভাগ	RBI-এর পরিমাপ ১৯৫৩-৫৪—১৯৫৬-৫৯		আয়েঙ্গার এবং মুখার্জির পরিমাপ ১৯৫২-৫৩—১৫৫৬		N.C.A.E.R-এর পরিমাপ ১৯৬০	
	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর
ওপরের ৫%	১৭.০	২৬.০	১৪.০	১৭.৫	.....	৩১.০
ওপরের ১০%	২৫.০	৩৭.০	৩৪.০	২৫.০	৩৩.৬	৪২.৪
ওপরের ৫০%	৬৯.০	৭৫.০	.....	.....	৭৯.৩	৮৩.০
নীচের ২০%	৯.০	৭.০	৭.৫	৮.৫	৪.০	৪.০

পাদটীকা ঃ সমস্ত পরিমাপ শতাংশে

মাথাপিছু ভোগব্যয় ঃ কোনো একটি দেশের জনগণের মাথাপিছু ভোগব্যয়ের ধরন পর্যালোচনা করলে, সেই দেশের দারিদ্র্যের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। যেহেতু ভোগব্যয় আয়ের ওপর নির্ভরশীল, আয় বাড়লে ভোগব্যয় বাড়ে। ব্যক্তিগত আয়-বণ্টন বৈষম্যের মতো, এক্ষেত্রেও সমাজের বিত্তশালী লোকজনের তুলনায় নিম্ন আয় সম্পন্ন লোকজনের ভোগব্যয় অনেক কম। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাথাপিছু ভোগব্যয়ের একটি হিসাব তৈরি করা হয়। সেই হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৭-৭৮ সালে মোট জনগণের নিম্নের ০-৩০ শতাংশ মোট ভোগ ব্যয়ের ১৫ শতাংশ ভোগ করে (গ্রামে) এবং ১৩.৭ শতাংশ (শহরে)। অন্যদিকে, ওপরের (৭০-১০০) শতাংশ মানুষ মোট ভোগব্যয়ের ৫১.৯ শতাংশ (গ্রামে) এবং ৫৩.৯ শতাংশ (শহরে)।

ওপরের রাশিতথ্যগুলি ১৯৮৭-৮৮ সালের হিসাবে নিম্নের ০-৩০ শতাংশের ক্ষেত্রে ১৫.৬ শতাংশ (গ্রামে) এবং ১৩.৩ শতাংশ (শহরে)। আবার ওপরের ৭০-১০০ শতাংশের জন্য ৫১.১ শতাংশ (গ্রামে) এবং ৫৫.৬ শতাংশ (শহরে)।

৮.৩ দৃষ্টান্ত এবং পরিমাপ

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ ও প্রতিষ্ঠান দারিদ্র্যের পরিমাপ করেছেন। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

(i) ওঝার পরিমাপ ঃ অধ্যাপক পি.ডি. ওঝা দৈনিক মাথাপিছু ২২৫০ ক্যালোরি খাদ্যমূল্যের ভিত্তিতে দারিদ্র্যের পরিমাপ করেছেন। ১৯৬০-৬১ ভিত্তি বছর (Base year)-র ভিত্তিতে ন্যূনতম মাসিক মাথাপিছু ১৫-১৮ টাকা ভোগব্যয়কে (শহরের ক্ষেত্রে) এবং ৮-১১ টাকা গ্রামের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যসীমা হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৯৬০-৬৬ সালে গ্রামাঞ্চলে ১৮৪ মিলিয়ন লোক (গ্রামের মোট লোকসংখ্যার ৫১.৮) ভাগ এবং শহরের মোট লোকের ৭.৬% দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী। সারা দেশের হিসাবে মোট জনসংখ্যার ৪৪% দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী।

(ii) মিনহাসের পরিমাপ ঃ অর্থনীতিবিদ্ মিনহাসের হিসাব অনুযায়ী যাদের মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ২০ টাকার ওপরে তারা দারিদ্র্যসীমার ওপরে এবং যাদের এই ব্যয় ২০ টাকার নীচে অবস্থান করে তারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী। এই দারিদ্র্যসীমার ভিত্তিতে, তিনি দেখিয়েছেন যে, ১৯৫৬-৫৭ সালের তুলনায় ১৯৬৭-৬৮ সালে গ্রামের দারিদ্র্যের সংখ্যা ও অনুপাত হ্রাস পেয়েছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে গ্রামাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ৬৫% দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল, যা ১৯৬৯-৭০ সালে কমে ৫০.৬%-এ নেমে এসেছে।

(iii) ডান্ডেকর ও রসের পরিমাপ ঃ ড. ভি. এম ডান্ডেকর এবং ড. নীলকণ্ঠ দাস গ্রাম ও শহরের জন্য আলাদা আলাদা ভোগব্যয় ধার্য করেছেন। তাঁদের মতে ১৯৬০-৬১-কে ভিত্তি বছর ধরে গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু বার্ষিক ১৮০ টাকা ভোগব্যয় এবং শহরাঞ্চলে ২৭০ টাকা হল ন্যূনতম ভোগব্যয়। ১৯৬৮-৬৯ সালকে ভিত্তি বছর ধরলে এই হিসাবটাই গ্রাম ও শহরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩২৪ টাকা এবং ৪৮৬ টাকা হয়। তাদের হিসাব অনুযায়ী ১৯৬৮-৬৯ সালে গ্রামের মোট জনসংখ্যার ৪০% এবং শহরের মোট জনসংখ্যার ৫০% এরও কিছু বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করত।

(iv) প্রণব বর্ধনের হিসাব ঃ ড. প্রণব বর্ধনের মতে মাসিক ১৫ টাকা মাথাপিছু ব্যয় হল দারিদ্র্যসীমা। সেই হিসাব অনুযায়ী ১৯৬০-৬১ সালে গ্রামাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ৩৮% এবং ১৯৬৭-

৬৮ সালে ৫৩% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করত। অর্থাৎ তাঁর হিসাব অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার মধ্যে দারিদ্র্যের অনুপাত বেড়েছে।

(v) মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ার হিসাব ঃ অর্থনীতিবিদ্ মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৭৩-৭৪ সময়কালের গ্রামীণ দারিদ্র্য সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখিয়েছেন যে, এই দুই দশকে দারিদ্র্যে কোনো নির্দিষ্ট পরিবর্তন হয়নি কখনও বেড়েছে, কখনও কমেছে, যেমন—পঞ্চাশের দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে ১৯৬০-৬১ সালে দারিদ্র্যের অনুপাত ৫০% থেকে কমে ৪০% হয়েছে। আবার ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বেড়ে ১৯৬৭-৬৮ সালে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। তারপর আবার কমতে থাকে। তিনি দেখিয়েছেন গ্রামীণ দারিদ্র্যের ঘটনা কৃষির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত যখন কৃষিতে ফসল ভালো হয়েছে তখন দারিদ্র্যের অনুপাত কমেছে, আবার যখন ফসল খারাপ হয়েছে তখন দারিদ্র্যের অনুপাত বেড়েছে।

সপ্তম অর্থ কমিশনের হিসাব ঃ

সপ্তম অর্থ কমিশন দারিদ্র্যের হিসাব করতে দারিদ্র্যসীমার নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন মোট পরিচিত Augmented poverty line হিসাবে। এক্ষেত্রে প্রচলিত মাথাপিছু ব্যক্তিগত ব্যয়ের সঙ্গে মাথাপিছু সরকারি ব্যয়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারি ব্যয়ের মধ্যে যেগুলি ধরা হয়েছে সেগুলি হল—

(i) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

(ii) জলসরবরাহ ও নিকাশি ব্যবস্থা

(iii) শিক্ষা

(iv) প্রশাসনিক (পুলিশ, কারাগার ও আদালত) ব্যয়

(v) রাস্তাঘাট

(vi) সমাজকল্যাণ

এই নতুন হিসাব অনুযায়ী ১৯৭০-৭১ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ (২৭৭ মিলিয়ন) দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করে। এর মধ্যে ২২৫ মিলিয়ন গ্রামে এবং ৫২ মিলিয়ন শহরে।

ভারতে দারিদ্র্যের দৃষ্টান্ত ঃ বি. এস. মিনহাস, আর এস জৈন এবং এস. ডি. তেন্ডুলকর ভারতে ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৮৭-৮৮ সময়কালের জন্য দারিদ্র্যের ঘটনাটি বিশ্লেষণ করেন। এই কাজে NSS (National Sample Survey) রাশিতথ্য ব্যবহার করেন।

এই বিশ্লেষণের ফলাফলগুলি নিম্নরূপ—

(i) গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের অনুপাত ১৯৭০-৭১ সালে ৫৮.৮% থেকে কমে ১৯৮৭-৮৮ সালে কমে ৪৮.৭ হয়েছে। শহরাঞ্চলে ওই সময়কালে সেটি ৪৬.২ থেকে ৩৭.৮% হয়েছে।

(ii) চরম সংখ্যাগত মানের দিক দিয়ে গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যের সংখ্যা ১৯৭০-৭১ সালে ২৫৮ মিলিয়ন থেকে বেড়ে হয়েছে ২৮৪ মিলিয়ন (১৯৮৭-৮৮)।

অন্যদিকে শহরাঞ্চলে ওই সময়কালের মধ্যে ৫০ মিলিয়ন থেকে বেড়ে সংখ্যাটি ৭৭ মিলিয়নে পৌঁছেছে।

(iii) ১৯৭১ সালের পর থেকে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.২% যেখানে দারিদ্র্যপীড়িত জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার জনপ্রতি ০.৯%। অর্থাৎ উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সঙ্গে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির এক ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে।

(iv) দরিদ্র জনসংখ্যার অনুপাতের ভিত্তিতে ভারতের রাজ্যগুলিকে দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমবিভাগে সেইসব রাজ্যগুলি আছে যাদের দরিদ্র জনসংখ্যার অনুপাত সর্বভারতীয় মাত্রার তুলনায় বেশি এবং অন্য বিভাগে আছে বাকি রাজ্যগুলি যাদের দরিদ্র জনসংখ্যার অনুপাত সর্বভারতীয় মাত্রার তুলনায় কম।

১৯৮৭-৮৮ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রথমবিভাগের মধ্যে আছে—বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরালা এবং কর্ণাটক। দ্বিতীয় বিভাগে রয়েছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু এবং কাশ্মীর, মণিপুর, রাজস্থান, ত্রিপুরা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং গুজরাট।

৮.৪ দারিদ্র্যের কারণ

ভারতের মতো দেশে দারিদ্র্যের নানাবিধ কারণ আছে, যেগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

(i) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঃ দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ হল ক্রমবর্ধমান বিরাট জনসংখ্যা। ভারতবর্ষ সারাবিশ্বের কেবলমাত্র ২.৪% ভূভাগের অধিকারী অথচ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৬ ভাগ ভারতের

বাসিন্দা। পরিকল্পনাকালে ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও যথেষ্ট। ফলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার খুব সামান্য।

(ii) বেকারত্ব ঃ দারিদ্র্যের প্রধান কারণ বেকারত্ব। ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। সরকার পরিকল্পনার প্রথমদিকে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রত্যক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। মনে করা হত, যে অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য দূর হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে, জাতীয় আয়ের উন্নতি হলেও দারিদ্র্যের সমস্যা থেকে যাচ্ছে। সেজন্য পরবর্তীকালে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

(iii) মুদ্রাস্ফীতি ঃ মুদ্রাস্ফীতি দারিদ্র্যের আর একটি কারণ। মূল্যস্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকায় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কমে এসেছে। গরিব মানুষরা তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে সমস্যায় পড়ছে। যারা দারিদ্র্যসীমার ঠিক ওপরে অবস্থান করছে, তারাও দারিদ্র্যসীমার নীচে আসবে এমন সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। ফলে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা, তা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(iv) শিল্পক্ষেত্রে রুগ্নতা ঃ দারিদ্র্যের অপর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল শিল্পক্ষেত্রে রুগ্ণতা। শিল্পক্ষেত্রে রুগ্নতার জন্য শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এর ফলে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করছে এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(v) প্রকৌশলগত নির্বাচন ঃ আমাদের দেশে বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে মূলধন নিবিড়-প্রকৌশল ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের জনসংখ্যা খুব বেশি হওয়ায় শ্রমিকের সংখ্যাও বেশি। সেক্ষেত্রে শ্রমনিবিড় প্রকৌশল প্রয়োগ করলে অধিক শ্রমিকের কাজের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু মূলধন নিবিড় প্রকৌশল প্রয়োগের কারণে বেকার সমস্যা তীব্রতর হয়েছে। ফলে দারিদ্র্যের সমস্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

(vi) আয় বণ্টন বৈষম্য ঃ ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশের অপর একটি বৈষম্য হল আয় বণ্টন বৈষম্য এবং এই কারণে দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশে অল্প সংখ্যক জনগণ জাতীয় আয়ের বেশিরভাগই ভোগ করে। অন্যদিকে অধিক সংখ্যক লোক অল্প পরিমাণে ভোগ করে।

তা ছাড়া কৃষিক্ষেত্রে আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, মাথাপিছু জাতীয় আয়ের স্বল্পতা, সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভোগ্যদ্রব্য জোগানের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে দারিদ্র্যের সমস্যাটি বিরাজ করছে।

৮.৫ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে গৃহীত কৌশল

ভারতে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেসব উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারিত হয়েছে, তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হল, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। পরিকল্পনার প্রথমদিকে মনে করা হয়েছিল যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার মাধ্যমে উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে। এবং তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটবে, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। দেখা যায় যে দেশের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ উন্নয়নের সুফলটি ভোগ করছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরির কথা বলা হয়েছিল।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সাধারণ মানুষ বিশেষ করে দুর্বল শ্রেণির মানুষের উন্নতির জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়, বিশেষ করে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থার উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

পঞ্চম পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, গরিব মানুষের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। ২২০ মিলিয়ন মানুষ এখন দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করছে। পঞ্চম পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য এমন কর্মসূচি গ্রহণের কথা বলা হয় যাতে সরাসরি কাজ করে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে বেকারত্ব, অর্ধবেকারত্ব, কর্মোৎপাদনশীলতা, কম মজুরি ইত্যাদি কারণগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। এই সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে বলা হয় যে, জাতীয় আয়ের উচ্চহার দারিদ্র্যের সমস্যার সমাধান করবে।

তা ছাড়া তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, তেমনই গ্রামের দুর্বল শ্রেণির (weaker section) জন্য বিশেষ কর্মসূচির ওপর জোর দেওয়া হয়।

সপ্তম পরিকল্পনায়, দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য গৃহীত বিশেষ কর্মসূচিগুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এও আশা করা হয় যে, এইসব কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৯৪-৯৫ সালে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ১০ শতাংশ এবং ২০০০ সালে ৫ শতাংশে পৌঁছাবে, যদিও এই বিবৃতির ব্যাপক সমালোচনা হয়।

পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতেও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দশম পরিকল্পনাতেও বলা হয়েছে যে, দারিদ্র্যের মতো একটি মূল সমস্যা বছরের পর বছর চলতে

পারে না। তাই সময়সীমা নির্দিষ্ট করে, সঠিক মূল্যায়ন ও রূপায়ণের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির উন্নতির ওপর গুরুত্ব দেওয়ার প্রস্তাব আছে।

৮.৬ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি

ভারত সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য পরিকল্পনাকালীন সময়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

(ক) ভূমি সংস্কার ঃ পরিকল্পনাকালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয় এবং প্রজা কৃষকদের নিরাপত্তার জন্য এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্‌বৃত্ত জমি বণ্টনের জন্য নানান পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

(খ) ব্যাংক ঋণ প্রসার ঃ ভারত সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জাতীয়করণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়েছেন এবং গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ যাতে সহজে ঋণ নিয়ে কৃষিকাজ এবং অন্যান্য কাজ করে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন ঋণদান সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমেও এই কাজ সংগঠিত করা হয়।

(গ) গণবণ্টন ব্যবস্থার প্রসার ঃ সরকার দরিদ্র জনগণের জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও ন্যায্য মূল্যের দোকানের (fair price shop) মাধ্যমে বণ্টনের ব্যবস্থা করেছে। দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী পরিবারগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ঘ) দারিদ্র্য দূরীকরণে নির্দিষ্ট কর্মসূচি ঃ

বিভিন্ন পরিকল্পনায় ভারত সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যেসব প্রকল্প গ্রহণ করেছে—

(i) গ্রামীণ কাজ কর্মসূচি (Rural works Programme)

(ii) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন এজেন্সি (Small Farmers Development Agency বা SFDA)

(iii) প্রান্তিক চাষি বা কৃষি শ্রমিক উন্নয়ন এজেন্সি (Marginal Farmers and Agricultural Labour Development Agency বা MFAL)

(iv) খরাপ্রবণ এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি (Drought Prone Area Programme বা DPAP)

(v) ন্যূনতম চাহিদা কর্মসূচি (Minimum Needs Programme বা MNP)

(vi) কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচি (Food For Works বা FFW)

(vii) সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি (Integrated Rural Development Programme বা IRDP)

(viii) জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ কর্মসূচি (National Rural Employment Programme বা NREP)

(ix) গ্রামীণ যুবদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (Training For Rural Youth For Self Employment বা TRYSEM)

(x) গ্রামীণ ভূমিহীনদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (Rural Landless Employment Guarantee Programme বা RLEGP)

(xi) জওহর রোজগার যোজনা (Jawahar Rojgar Yojane বা JRY)

(xii) স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (Swarnajoyanti Gram Swarojger Yojana বা SJGSY)

৮.৭ অনুশীলনী

(১) দারিদ্র্যসীমা বলতে কী বোঝেন?

(২) ভারতে দারিদ্র্যর বিভিন্ন পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৩) ভারতে দারিদ্র্যের কারণগুলি কী কী?

(৪) দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

(i) Indian Economy : R. Dutt & Sundaram

(ii) Indian Economy : Mishra & Puri

(iii) The Indian Economy : Parmit Chowdhury

একক ৯ ❑ বেকারত্ব

গঠন

৯.১ বেকারত্বের ধারণা

৯.২ বেকারত্বের পরিমাপ

৯.৩ বেকারত্বের ধরন

৯.৪ বেকারত্বের কারণসমূহ

৯.৫ বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য গৃহীত কর্মসূচি

৯.৬ অনুশীলনী

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ বেকারত্বের ধারণা (Concept of Unemployment)

ভারতের মতো জনবহুল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় বেকারত্ব সমস্যার উদ্ভব হয়। কোনো কর্মক্ষম ব্যক্তি ১৫-৬০ বছর বয়স্ক, তার যোগ্যতা সত্ত্বেও যদি উৎপাদনমুখী ও আয় সৃষ্টিকারী কার্যকলাপে নিযুক্ত হতে না পারে, তবে তাকে বেকার বলা হয়।

বেকারত্বের ধারণা (concept of unemployment) কয়েক ধরনের হয়। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংগঠন (National Sample Survey Organisation বা NSSO) ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে যেসব সমীক্ষা করেছে, তাকে তারা বেকারত্ব সম্পর্কে তিনটি ধারণার কথা বলেছে। পরিকল্পনা কমিশনও বেকারত্বের সমস্যা আলোচনা করার সময় এই ধারণাগুলি ব্যবহার করেছে। NSSO যে তিনটি ধারণা দিয়েছে, সেগুলি হল—

(১) সচরাচর অবস্থা বেকার (Usual Status Unemployment)

(২) সাম্প্রতিক সাপ্তাহিক অবস্থা বেকার (Current Weekly Status Unemployment)

(৩) সাম্প্রতিক দৈনিক অবস্থা বেকার (Current Daily Status Unemployment)

যেসব মানুষ কাজ না পেয়ে একবছর বা তার বেশি সময়কাল নিয়োগহীন অবস্থায় থাকেন তাদের স্বাভাবিক বা সচরাচর অবস্থা বেকার বলা হয়। এই বেকারত্ব দীর্ঘকালীন, একে প্রকাশ বা উন্মুক্ত বেকারত্বও বলা হয় (Open unemployment)। সাধারণত শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে এই ধরনের বেকারত্ব লক্ষ করা যায়।

যদি কোনো ব্যক্তি সপ্তাহের সাতদিনে অন্তত এক ঘন্টার জন্যও কাজ না পান, তখন তাকে সাপ্তাহিক অবস্থার বেকার বলা হয়।

যদি কোনো সক্ষম মানুষ দিনে এক ঘন্টাও কাজ না পান তখন তাকে দৈনিক বেকার বলা হয়। দিনে এক ঘন্টা থেকে চার ঘন্টা কাজ পেলে ধরা হবে যে তিনি অর্ধদিবস কাজ করলেন।

৯.২ বেকারত্বের পরিমাপ (Magnitude of Unemployment)

সারা ভারতে ৯৪৭টি কর্মনিয়োগ কেন্দ্রের (Employment Exchange) হিসাব অনুযায়ী ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৪.৮ কোটি মানুষ কাজের জন্য তাদের নাম নথিভুক্ত করেছিলেন এর মধ্যে সত্তর ভাগ শিক্ষিত (দশম মান বা তার বেশি) এবং ২৬ ভাগ মহিলা। দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৬৯.৩ লক্ষ)

[তথ্যসূত্র ঃ GOI Economic Survey ২০০৪-২০০৫]

NSSO-এর ৫৫তম সার্ভে অনুযায়ী ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে ১৯৯৯-২০০০ সালের মধ্যে কর্মনিয়োগের হার বাৎসরিক ১% বেড়েছে। সংখ্যাগত দিক দিয়ে ১৯৮৩ সালে নিয়োগের সংখ্যা ছিল ৩০৩ মিলিয়ন যেটা ১৯৯৪ সালে বেড়ে হয়েছে ৩৭৪ মিলিয়ন এবং ২০০০ সালে হয়েছে ৩৯৭ মিলিয়ন। ২০০০ সালে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৮.১১ মিলিয়ন, যা মোট নিয়োগের ৭ ভাগ।

সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মনিয়োগের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ, সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগের হ্রাস—১৯৮৩-৯৪ সালের মধ্যে যা ছিল ১.৫২% সেই হার ১৯৯৪-২০০০ সময়কালে কমে হয়েছে (–) ০.০৩%।

ভারত সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষার হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত ভারতে গ্রাম ও শহরের কর্মনিয়োগ ও বেকারত্বের একটি চিত্র পাওয়া যায়। ১৯৯৯-২০০০ সালে ভারতে মোট জনসংখ্যা ছিল ১০০৩.৯৭ মিলিয়ন। এর মধ্যে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৩৬৩.৩৩ মিলিয়ন এবং কাজ করে এমন শ্রমিকের সংখ্যা ৩৩৬.৭৫ মিলিয়ন। অর্থাৎ বেকারের সংখ্যা ২৬.৫৮ মিলিয়ন (৭.৩২%)।

১৯৯৯-২০০০ সালে গ্রামাঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ৭২৭.৫০ মিলিয়ন, মোট শ্রমিকের সংখ্যা ২৭০.৩৯ মিলিয়ন, কাজ করে এমন শ্রমিক ২৫০.৮৯ মিলিয়ন অর্থাৎ বেকারের সংখ্যা ১৯.৩০ মিলিয়ন (৭.২১%)।

শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ১৯৯৯-২০০০ সালে মোট জনসংখ্যা ২৭৬.৪৭ মিলিয়ন, মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৯২.৯৫ মিলিয়ন এবং কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৮৫.৮৪ মিলিয়ন। অর্থাৎ, বেকারের সংখ্যা ৭.১১ মিলিয়ন (৭.৬৫%)।

৯.৩ বেকারত্বের ধরন (Types of unemployment)

যেসব সক্ষম মানুষ চলতি মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও কাজ পায় না সাধারণত তাদের বেকার বলা হয়। উন্নত দেশ এবং স্বল্পোন্নত দেশের বেকারত্বের প্রকৃতি আলাদা, উন্নত দেশে ব্যাবসা-বাণিজ্যের মন্দার কারণে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া ওইসব দেশে শিল্প কাঠামোর পরিবর্তন বা উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তনের কারণে কাঠামোজনিত বেকারত্বের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন—

(i) মরশুমি বেকারত্ব (Seasonal Unemployment) ঃ অনেক সময় দেখা যায় যে শ্রমিকদের বছরে প্রায় কয়েকমাস কোনো কাজ থাকে না, কেবলমাত্র চরম ঋতুতে (peak season) তারা কাজ পায়। এই ধরনের অবস্থাকে মরশুমি বেকারত্ব বলা হয়। যেমন—আমাদের দেশে কৃষি শ্রমিকদের বছরে কয়েকমাস কাজ থাকে না। কিছু কিছু শিল্পকাজ মরশুমি প্রকৃতির হয়—যেমন শীতবস্ত্র উৎপাদনের কাজ। এইসব ক্ষেত্রের কর্মীরা স্বভাবতই বছরের কোনো কোনো সময় বেকারত্বের শিকার হয়।

(ii) প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব (Disguised Unemployment) ঃ এ ধরনের বেকারত্ব সাধারণত গ্রামাঞ্চলে কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে দেখা যায়। কৃষি এদের পারিবারিক পেশা হওয়ায়, পরিবারের যেসব কর্মক্ষম

ব্যক্তির অন্য কোনো উপজীবিকা নেই তারা সবাই কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকেন। ধরা যাক, কোনো একটি পরিবারে সাতজন কর্মক্ষম সদস্য রয়েছেন এবং তারা সবাই তাদের কয়েক বিঘা চাষযোগ্য জমিতে কাজ করেন। তাদের ওই জমিতে পাঁচজন কর্মী হলেই যেখানে চাষ করা যায় সেখানে হয়তো সাতজন তাতে যুক্ত আছেন। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত দুজনের প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য। অর্থাৎ তাদেরকে ওই কাজের বাইরে সরিয়ে নিলেও মোট উৎপাদন হ্রাস পায় না। তাই এই দুজনকে বলা হয় প্রচ্ছন্ন বেকার। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তারা কাজে যুক্ত আছেন। প্রকৃতপক্ষে ওই দুজনই প্রচ্ছন্ন বেকার।

(iii) কাঠামোগত বা প্রযুক্তিগত বেকারত্ব (Structural Unemployment) ঃ আধুনিক শিল্প উৎপাদন পদ্ধতিতে যন্ত্রের ব্যবহার হয় ব্যাপকভাবে। শ্রমিকরা প্রশিক্ষণ নিয়ে এইসব উৎপাদন কাজে যুক্ত হন। কিন্তু প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন প্রযুক্তি বাতিল হয়ে যায়। এই নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে যারা নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারে না তারা কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ে। এ ধরনের বেকারত্বকে বলা হয় কাঠামোগত বা প্রযুক্তিগত বেকারত্ব। যেমন—সাম্প্রতিককালে ব্যাংক ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে কম্পিউটার চালিত করা হচ্ছে। স্বভাবতই বর্তমান ব্যাংকের কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে এবং কম সংখ্যক কর্মীর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এ ছাড়া কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগের ফলে শুধু দক্ষ শ্রমিকরা কৃষিক্ষেত্রে কাজ পাচ্ছে। এভাবে প্রযুক্তিগত বেকারত্বের সৃষ্টি হচ্ছে।

(iv) বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব (Tradecycle Unemployment) ঃ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বাণিজ্যচক্রের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ধরনের অর্থনীতিতে মাঝে মধ্যে মন্দা দেখা যায়। মন্দার সময় শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা কমে যায়। ফলে শিল্প শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ে। এই ধরনের বেকারত্বকে বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব বলা হয়। ভারতবর্ষ মিশ্র অর্থনীতির দেশ হলেও, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়। তা ছাড়া বর্তমান উদারীকরণের ক্ষেত্রে ওই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আরও প্রকট হয়ে দেখা যাচ্ছে। ফলে বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্বের ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(v) সংঘর্ষজনিত বেকারত্ব (Frictional Unemployment) ঃ বাজারে চাহিদা ও জোগানের অসামঞ্জস্যের কারণে এই ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়। তা ছাড়া উৎপাদন পদ্ধতিতে আমূল

সংস্কারের ফলে অথবা শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের অবনতির ফলে এই বেকারত্বজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(vi) শিক্ষিত বেকারত্ব (Unemployment of Educated Person) ঃ যখন কোনো দেশে শিক্ষিত ও কর্মক্ষম ব্যক্তিরা তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত কর্মনিযুক্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তাকে শিক্ষিত বেকারত্ব বলা হয়। যেমন—ভারতে পরিকল্পনাকালীন সময়ে কর্মমুখী শিক্ষার তুলনায় প্রথাগত শিক্ষা অধিক বিস্তৃত হয়েছে। ফলে প্রচুর যুবক-যুবতি ওই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়নি।

৯.৪ বেকারত্বের কারণসমূহ (Causes of Unemployment)

আমাদের দেশে বেকারত্বের নানাবিধ কারণ উল্লেখ করা যায়। সেগুলি হল ঃ

(i) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ ঃ পরিকল্পনাকালীন সময়ে আমাদের দেশে জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে শ্রমের জোগান বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেই অনুযায়ী কর্মসংস্থান হয়নি। ফলে বেকারত্বের চাপ বেড়েছে। ভারতে এই বিপুল জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে, ফলে গ্রামাঞ্চলে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ii) সেচের অপর্যাপ্ত সুবিধা ঃ ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে শস্যচাষের আওতাধীন মোট আবাদি জমির মধ্যে মাত্র ১৭ শতাংশ জমি সেচের সুবিধাযুক্ত। ১৯৯২-৯৩ সালে ওই অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫ শতাংশ হলেও মোট আবাদি জমির প্রায় ২/৩ অংশ বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল।

সেক্ষেত্রে জমিতে বছরে একবার মাত্র ফসল ফলানো সম্ভব। তাই প্রচুর পরিমাণে মরশুমি বেকারত্বের সৃষ্টি হয়।

(iii) বিভিন্ন শিল্পে কর্মনিয়োগ বৃদ্ধির ধীরগতি ঃ বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে শিল্পক্ষেত্রে শ্রম জোগান বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে কর্মনিয়োগের হারে বৃদ্ধি ঘটেনি। এর ফলে শিল্পক্ষেত্রে সমস্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

(iv) গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিকের আগমন ঃ গ্রামাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মসংস্থানের আশায় এক বিপুল পরিমাণ শ্রমিক কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্পক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ফলে শিল্পক্ষেত্রে পরিযায়ী শ্রমিকের (Migrated labour) সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেইহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়নি।

(v) মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি ঃ আমাদের দেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিদেশি সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বেশিরভাগ উৎপাদন পদ্ধতি যন্ত্র-নির্ভর, যেখানে শ্রমিকের তুলনায় যন্ত্রের গুরুত্ব বেশি। কিন্তু ভারতের মতো জনবহুল দেশে উৎপাদন কৌশল শ্রম-নিবিড় হওয়ার পরিবর্তে মূলধন-নিবিড় হওয়ার কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে, বেকার সমস্যা, দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(vi) ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা ঃ যাবৎকাল আমাদের দেশে প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে। পরিকল্পনাকালে মানব উন্নয়নের জন্য কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারের ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি, ফলে শিক্ষিত যুবক-যুবতিরা কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বর্তমানকালে, কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কারণে সাধারণ শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। তবে সাম্প্রতিককালে কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৯.৫ বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য গৃহীত কর্মসূচি ঃ (Programmes for cradication of unemployment)

ভারতে পরিকল্পনার প্রথম যুগে মনে করা হত যে অর্থনৈতিক প্রগতির হার দ্রুত হলেই কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে এবং বেকারত্ব হ্রাস পাবে। সরাসরি বেকারত্ব হ্রাসের জন্য কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। যদিও বিভিন্ন পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্যমাত্রাগুলি পূরণ হয়নি। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ভারত সরকার বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য এম. ভগবতীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৭৩ সালে এই কমিটির সুপারিশগুলি প্রকাশ করা হয়। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সেগুলি হল ঃ

(i) গ্রামীণ কর্মপ্রকল্প (Rural Works Programme) ঃ এই কর্মসূচিতে গ্রাম এলাকায় স্থায়ীভাবে আয় সৃষ্টি করতে পারে এমন উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়। এর ফলে গ্রামীণ

বেকার সমস্যা সামগ্রিকভাবে দূরীকরণ করা যাবে না, কিন্তু বেকারত্বের তীব্রতা কিছুটা লাঘব করতে পারবে।

(ii) প্রান্তিক চাষি এবং ভূমিহীন শ্রমিক প্রকল্প (Marginal Farmers and Agricultural Labourers Programme) ঃ এই প্রকল্পে প্রান্তিক চাষি এবং ভূমিহীন শ্রমিকদের কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম যেমন, ডেয়ারি, মুরগি পালন, মৎস্যচাষ প্রভৃতির জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

(iii) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থা (Small Farmers Development Agency) ঃ ক্ষুদ্র চাষিরা যাতে তাদের কাজকর্মে বৈচিত্র্য আনতে পারে, সেজন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সংস্থা স্থাপন করা হয়। তা ছাড়া কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে এই সংস্থা চাষিদের আর্থিক সাহায্য দিত।

(iv) সুসংহত শুষ্ক ভূমি উন্নয়ন (Integrated Dry Land Agricultural Development) ঃ এই কর্মসূচির অধীনে কৃষির উন্নতির জন্য কিছু স্থায়ী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যেমন—ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি উন্নয়ন, জলসেচের প্রসার প্রভৃতি। এগুলি শ্রম-নিবিড় কর্মসূচি, প্রত্যাশিত হিসাব অনুযায়ী প্রতি এক কোটি টাকার কাজের জন্য ১৫ হাজার বেকারের কর্মসংস্থান হবে।

(v) কৃষিসেবা কেন্দ্র (Agro-Service Centre) ঃ এই প্রকল্পের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত (Under-graduate, Diploma holders in Mechanical & Electrical, Graduate in science and Agriculture etc.) বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হয়। এই স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে বেকারদের কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি এবং মেরামতির কারখানা, কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়া খাটানো এবং কৃষিযন্ত্রপাতির spare-parts ইত্যাদির ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য করা হয়।

(vi) অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (Area Development Scheme) ঃ এই প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত কিছু অঞ্চলের রাস্তাঘাট, বাজার কমপ্লেক্স ইত্যাদি পরিকাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

(vii) জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিয়োগ প্রকল্প (National Rural Employment Programme বা NREP) ঃ ১৯৮০ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রকল্প চালু হয়। গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে যারা শুধুমাত্র মজুরির ওপর নির্ভর করে এবং কৃষিক্ষেত্রে মরশুমি বেকারত্বের সময় দুর্দশায় পতিত হয়,

তাদের সাহায্য করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। কর্মহীন বেকারদের জন্য বাৎসরিক ৩০০-৪০০ মিলিয়ন জন-দিবস (man-days) কর্মসংস্থানের লক্ষ্য ধার্য করা হয়। এই প্রকল্পের অন্তর্গত কাজগুলি হল, পানীয় জলের ব্যবস্থা, জলসেচের জন্য কূপ খনন, গ্রামীণ জলাধার নির্মাণ, ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা, গ্রামীণ রাস্তাঘাট তৈরি, বিদ্যালয় এবং বালোয়াদি কেন্দ্রের গৃহনির্মাণ, পঞ্চায়েত কার্যালয় নির্মাণ ইত্যাদি। ১ এপ্রিল ১৯৮৯ তারিখ থেকে NREP-কে জওহর রোজগার যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(viii) গ্রামীণ ভূমিহীনদের নিয়োগ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (Rural Landless Employment Guarantee Scheme বা RLEGP) ঃ ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে NREP প্রকল্পের পরিপূরক হিসাবে এই প্রকল্প চালু করা হয়। RLEGP-এর উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ অর্থনীতিতে সম্পদের সৃষ্টি করে খেত মজুরদের নিয়োগ নিশ্চিত করা। গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানোও এই প্রকল্পের একটি অন্যতম লক্ষ্য। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, মহিলা, তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সপ্তম পরিকল্পনার প্রথম চার বছরে, ১১৫৪ মিলিয়ন জন-দিবস (man-days) কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রকল্পকেও ১৯৮৯ সালের ১ এপ্রিল জওহর রোজগার যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(ix) সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (Integrated Rural Development Programme বা IRDP) ঃ গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চালু প্রকল্পগুলিকে ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে একত্রিত করা হয়, এর নাম দেওয়া হয় Integrated Rural Development Programme বা IRDP। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে উৎপাদনের উপকরণ জোগান দিয়ে, তাদের স্বনিযুক্তিতে সাহায্য করাই হল এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

(x) জওহর রোজগার যোজনা (Johar Rojgar Yojana বা JRY) ঃ ১৯৮৯ সালে এই যোজনা চালু করা হয়। সেই সময়ে প্রচলিত NREP এবং RLEGP প্রকল্প দুটিকেও এর আওতায় আনা হয়। গ্রামীণ জনগণের লাভজনক নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। গ্রামীণ পরিকাঠামো এবং যৌথ সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানোও এর অন্যতম লক্ষ্য। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনগণকে নানাভাবে সাহায্য করা হয়। সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

(xi) অন্যান্য ব্যবস্থা ঃ গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের জন্য আরও বিভিন্ন রকমের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—ডেয়ারি উন্নয়ন প্রকল্প, মৎস্যচাষি উন্নয়ন সংস্থা, কাজের বিনিময়ে খাদ্যপ্রকল্প (FFW), খরাপ্রবণ এলাকা প্রকল্প (Drought Prone Area Programme বা DPAP), ইন্দিরা আবাস যোজনা, শহরের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্প (Self-Employment Programme for the Urban Poor বা SEPUP), শহরের শিক্ষিত যুবকদের স্বনিযুক্তি প্রকল্প (Self Employment Programme for the Educated Urban Youth বা (SEEUY) প্রভৃতি।

কর্মনিয়োগে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ১৯৯৩-৯৪ সালে দুটি নতুন প্রকল্প ঘোষিত হয়েছে। যেমন নিয়োগ নিশ্চিত প্রকল্প (Employment Assurance Scheme বা FAS) এবং শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা (Prime Minister Rojgar Yojona বা PMRY)।

এত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষে বেকার সমস্যা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আসলে প্রতি বছর যতজন নতুন শ্রমিক শ্রমের বাজারে প্রবেশ করছে, মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ তার থেকে কম, তাই বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেকার সমস্যার তীব্রতা কমাতে গেলে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বেকারি এবং দারিদ্র্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তাই বেকারত্বের সমস্যা যত তীব্র হবে দারিদ্র্যজনিত সমস্যাও ততই বৃদ্ধি পাবে। সেক্ষেত্রে ভারতের ব্যাপক দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হবে না। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ওপরও জোর দিতে হবে। কৃষিভিত্তিক নানান গ্রামীণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে।

দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বছরে এক কোটি কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য সুপারিশ করার জন্য ভারতের পরিকল্পনা কমিশন এম.পি. গুপ্তার নেতৃত্বে একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করে। এই টাস্ক ফোর্সের হিসাব অনুযায়ী সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ গত দশকে দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে সরকারি ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থান ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। তাই অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের জন্য অসংগঠিত ক্ষেত্রেই অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। মোট কর্মসংস্থানের ৯২% এই অসংগঠিত ক্ষেত্রেই ঘটছে।

৯.৬ অনুশীলনী

(১) বেকারত্বের ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

(২) বেকারত্ব কয় প্রকারের ও কী কী?

(৩) শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে বেকারত্বের কারণগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

(৪) বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, তার একটি সমালোচনামূলক আলোচনা করুন।

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

(i) Indian Economy—R. Dutt & Sundaram

(ii) Indian Economy—Mishra & Puri

একক ১০ ❑ জন বিস্ফোরণ (Population Explosion)

গঠন

১০.১ জনসংখ্যা সংক্রান্ত অবস্থা

১০.২ জনসংখ্যার গঠনগত পরিবর্তনের তত্ত্ব

১০.৩ ভারতের অভিজ্ঞতা

১০.৪ জন বিস্ফোরণের ফলাফল

১০.৫ জনসংখ্যা নীতি

১০.৬ পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি

১০.৭ অনুশীলনী

১০.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ জনসংখ্যা সংক্রান্ত অবস্থা (Population Status)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতবর্ষে মোট জনসংখ্যা ছিল ২৩৬ মিলিয়ন। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সংখ্যাটি বেড়ে হয় ৮৪৪ মিলিয়ন। আবার ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা হল ১০২৭ মিলিয়ন।

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করলে তিনটি পর্যায় লক্ষ করা যায়। **প্রথম পর্যায়** ১৮৯১ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত ৩০ বছর বিস্তৃত। **দ্বিতীয় পর্যায়** ১৯২১ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এবং **তৃতীয় পর্যায়** ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত।

প্রথম পর্যায়ে, ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ২৩৬ মিলিয়ন (১৮৯১) থেকে বেড়ে হয়েছিল ২৫১ মিলিয়ন (১৯২১)। অর্থাৎ এই তিরিশ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছিল ১৫ মিলিয়ন। এই সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে কম ছিল। কারণ এই সময়কালে উচ্চ জন্মহারের সঙ্গে মৃত্যুহারও খুব বেশি ছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, জনসংখ্যা ২৫১ মিলিয়ন (১৯২১) থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৬১ মিলিয়ন (১৯৫১)। অর্থাৎ এই তিরিশ বছরে ১১০ মিলিয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ

হল মৃত্যু হারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হ্রাস, এবং তুলনামূলকভাবে জন্মহারের ক্ষেত্রে সামান্য হ্রাস। এই সময়কালে মহামারি, প্লেগ, কলেরা, স্মল পক্স ইত্যাদি মারণ রোগগুলি ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছিল। ফলে মৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছিল।

তৃতীয় পর্যায়ে, জনসংখ্যা ৩৬১ মিলিয়ন (১৯৫১) থেকে বেড়ে ৬৮৩ মিলিয়ন (১৯৮১) হয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যে রেকর্ড পরিমাণ, ৩২২ মিলিয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময় পরিকল্পনার শুরু হয়, হাসাপাতল এবং চিকিৎসা পরিসেবার প্রসার ঘটে এবং মৃত্যুহার দারুণভাবে কমে যায়। ফলস্বরূপ, এই সময় জনবিস্ফোরণ দেখা যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় বছরে ২.১১ শতাংশ।

১৯৮১-৯১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ৬৮৩ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮৪৪ মিলিয়নে। অর্থাৎ দশ বছরে বৃদ্ধি ঘটে ১৬১ মিলিয়ন। এই দশকেও পূর্বের ন্যায় ২.১১ শতাংশ হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সময়কালের মধ্যে জনসংখ্যা ৮৪৪ মিলিয়ন থেকে বেড়ে হয় ১০২৯ মিলিয়ন। অর্থাৎ বৃদ্ধি ঘটে ১৮৩ মিলিয়ন।

কোনো একটি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সেই দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহারের ওপর নির্ভরশীল। ভারতে এই দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ জন্মহার ও মৃত্যুহারের তফাতের মধ্যেই পাওয়া যায়। নীচের তালিকা থেকে ভারতের জন্ম ও মৃত্যুহার সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

তালিকা নং ১

ভারতে বার্ষিক গড় জন্ম ও মৃত্যুহার

দশক	জন্মহার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
১৯০১-১৯১০	৪৯.২	৪২.৬	৬.৬
১৯১১-১৯২০	৪৮.১	৪৭.২	০.৯
১৯২১-১৯৩০	৪৬.৪	৩৬.৩	১০.১
১৯৩১-১৯৪০	৪৫.২	৩১.২	১৪.০
১৯৪১-১৯৫০	৩৯.৯	২৭.৪	১২.৫
১৯৫১-১৯৬০	৪০.৯	২২.০	১৮.৯
১৯৬১-১৯৭০	৪১.২	১৯.০	২২.২

দশক	জন্মহার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
১৯৭১-১৯৮০	৩৬.৮	১৫.৭	২১.১
১৯৮১-১৯৯০	৩৩.৭	১২.৬	২১.১

Source : Census of India 1971, Census of India 1918.

ওপরের তালিকা থেকে দেখা যায় যে, ১৯২১ সালের আগে পর্যন্ত জন্মহার ও মৃত্যুহার দুই-ই বেশি ছিল। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারও ছিল কম। কিন্তু ১৯২১ সালের পর থেকে, জন্মহারে তেমন একটা পরিবর্তন লক্ষ না করা গেলেও মৃত্যুহার দ্রুত কমতে থাকে। ১৯১১ থেকে ১৯২০-তে যেখানে মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে ৪৮.৬ সেখানে ১৯৬১ থেকে ১৯৭০-এ তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৮.৬-এ স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে।

১০.২ জনসংখ্যার গঠনগত পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Demographic Transition)

জনসংখ্যা পরিবর্তনের তত্ত্বটি ইতিহাসভিত্তিক অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। বর্তমান শিল্পোন্নত দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় জনসংখ্যা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনটি ধাপ (stage) লক্ষ করা যায়।

প্রথম ধাপে, যখন দেশের অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভরশীল, তখন জন্মহার এবং মৃত্যুহার দুই-ই খুব বেশি থাকে। ফলস্বরূপ জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হারও কম থাকে। দ্বিতীয় ধাপে, যখন দেশে শিল্পায়নের সূচনা হয় এবং জনগণের মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পায়। কিন্তু জন্মহারে লক্ষণীয় কোনো পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং এই দ্বিতীয় ধাপে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ ধাপে দেখা যায় যে, দেশ যখন একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয় তখন জনগণের আর্থিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। দেশ নগরায়ণের দিকে বেশি ঝোঁকে, ফলে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেকেই তাদের জীবনযাত্রার মান একটা স্তরে বজায় রাখতে আগ্রহী থাকে। ফলে জন্মহারেও হ্রাস ঘটে। তা ছাড়া উন্নত অর্থব্যবস্থাতে মৃত্যুহারও কম থাকে। অর্থাৎ উন্নয়নের এই স্তরে জন্মহার ও মৃত্যুহার দুই-ই কম থাকার ফলে একাট স্থির ও অপেক্ষাকৃত কম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বজায় থাকে।

১০.৩ ভারতের অভিজ্ঞতা (Indian Experience)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশক পর্যন্ত ভারতবর্ষ, প্রথম ধাপে অবস্থান করেছে। তার কারণ, আমরা দেখেছি, ভারতে এই সময় পর্যন্ত জন্মহার ও মৃত্যুহার দুই-ই বেশি ছিল (যেমন ১৯২০ সালে জন্মহার ৪৮.১ এবং মৃত্যুহার ৪৭.২) ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম ছিল (০.৯) পরবর্তীকালে বিশেষ করে ১৯৫০-এর দশক থেকে, ভারত জনসংখ্যা পরিবর্তনের দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশ করেছে। এই সময়ে মৃত্যুহার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭০-এর দশকে এই মৃত্যুহার ১৯২০-এর দশকের অর্ধেকেরও কম হয়েছে। (প্রতি হাজারে ১৯)। কিন্তু জন্মহার সেই হারে হ্রাস পায়নি, তবে ভারতের ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় ধাপের বৈশিষ্ট্যগুলি শিল্পোন্নত দেশের থেকে আলাদা। ভারতের ক্ষেত্রে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ছাড়াই।

ভারতবর্ষ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকে। ১৯৯১ সালে মোট পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে ৬৩.৬৯ শতাংশ কৃষিকাজের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। তবে, ১৯৯১ সালে নতুন অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy) ঘোষণা করার পর অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই অর্থনীতির তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য হল উদারীকরণ (Liberalisation), বেসরকারিকরণ (Privatization) এবং বিশ্বায়ন (Globalisation)। এই নীতি গ্রহণ করার ফলে ভারতের শিল্পায়নের গতি দ্রুততর হয়েছে।

(ক) মৃত্যুহার হ্রাস (Decline in the Death Rate) ঃ ভারতে মৃত্যুহার যে ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে তার অন্যতম কারণ হল চিকিৎসা পরিসেবার উন্নতি। এই উন্নতির ফলে, নানা ধরনের অসুখবিসুখ, মহামারি (যেমন—কলেরা, পক্স ইত্যাদি), যক্ষ্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। তা ছাড়া উন্নত চিকিৎসা পরিসেবা প্রতিটি জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য পরিসেবার উন্নতি ঘটানো হয়। জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের (PHC) উন্নতি ঘটানো হয়। ফলে মৃত্যুহার (Crude Death Rate—CDR) হ্রাস পায়। মৃত্যুহারের এই হ্রাস, দেশে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ শুরু হওয়ার অনেক আগেই ঘটে যায়। ফলে এ কথা বলা যায় না যে, জনসংখ্যার গঠনগত পরিবর্তনের তত্ত্ব অনুসরণ করে জন্মহারেরও হ্রাস ঘটবে। বাস্তবে দেখা যায় মৃত্যুহার হ্রাস পেলেও জন্মহারে সেরূপ পরিবর্তন ঘটেনি।

জন্মহার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি। ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ১৯৭০-৮০ সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল যথেষ্ট বেশি (২.২২ শতাংশ)।

(খ) উচ্চ জন্মহার (High Birth Rate) ঃ ভারতে জন্মহার বেশি হওয়ার কারণগুলি হল—

(i) মহিলাদের সার্বিক বিবাহ (Universal Marriage of women) ঃ মহিলাদের মধ্যে বিবাহ একটি সর্বজনীন ঘটনা। অর্থাৎ প্রায় সকল মহিলারই বিবাহ হয়ে থাকে। নানারকম সামাজিক কারণে প্রায় প্রতিটি যোগ্য মহিলারই বিবাহ হয়। ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৪০-৪৪ বছর বয়স্কা মহিলাদের মধ্যে একবারও বিবাহ হয়নি, এমন সংখ্যা মাত্র ০.৫৫ শতাংশ। যেহেতু বিবাহিতা মহিলারা শিশুর জন্ম দেয়, এই ঘটনাটি জন্মহার বেশি হওয়ার একটি অন্যতম কারণ।

(ii) সর্বজনীন মাতৃত্ব (Universal Motherhood) ঃ বিবাহিতা মহিলাদের মধ্যে মাতৃত্ব প্রায় সর্বজনীন, অর্থাৎ সাধারণত প্রতিটি বিবাহিতা মহিলারই শিশু জন্মায়। মাতৃত্ব বিবাহিতা মহিলাদের কাছে এক সেরাপ্রাপ্তি ১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী, ৫০ বছর বা তার বেশি বয়স্কা মহিলাদের ক্ষেত্রে মাত্র ৬.১ শতাংশ মহিলার কোনো শিশু জন্মায়নি। তবে মনে রাখা দরকার এই মহিলাদের মধ্যে অবিবাহিতা মহিলাদেরও ধরা হয়েছে।

(iii) মহিলাদের বিবাহের বয়স (Age at Marriage among Women) ঃ আমাদের দেশে মহিলাদের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ার প্রথা চালু আছে। অতীতে (১৮৯১-১৯০১ দশকে) ১৪ বছরের কম বয়স্কা বিবাহিতার সংখ্যা ছিল ২৭ শতাংশ। তবে, ১৯২৯ সালের 'Child Marriage Restraint Act' চালু হওয়ার পর অবস্থায় কিছুটা উন্নতি ঘটে। ১৯২১ সালে, বিবাহের গড় বয়স ছিল ১৩.৭ বছর, ১৯৬১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৫.৮ বছর। ১৯৯৪ সালে এই বয়স বেড়ে হয়েছে ১৯.৪ বছর। যেহেতু একজন মহিলার শিশু ধারণ করার হার সর্বোচ্চ হয় ১৫-৪৪ বছরের মধ্যে তাই, বেশিরভাগ মহিলার এই বয়সের মধ্যে বিবাহের ঘটনা ঘটলে, শিশু জন্মের হার বেশি হয়।

(iv) আংশিক সফল জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Partially Effective Birth Control Methods) ঃ আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সেগুলি আংশিকভাবে সফল হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ত্রুটিমুক্ত ছিল না, আবার অনেক ক্ষেত্রে কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সদিচ্ছার অভাবের দরুন জন্ম নিয়ন্ত্রণ ফলপ্রসূ হয়নি। এ ছাড়া অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ধর্মীয় গোঁড়ামি,

কুসংস্কার, পুরুষ শিশুর প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি নানা কারণ লক্ষ করা যায়। ১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী ১৫-৪৯ বছর বয়স্কা কোনো মহিলা গড়ে ৪.৯৯টি শিশুর জন্ম দিয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ১০০ জনে জন্মের হার ৪৯৯-এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৫.০৭ এবং শহরাঞ্চলে ৪.১৮।

১০.৪ জন বিস্ফোরণের ফলাফল (Effects of Population Explosion)

(i) নিম্ন মাথাপিছু আয় (Low per capita Income) ঃ ভারতে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে, জাতীয় আয়ের যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহারের জন্য জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি আশানুরূপ কার্যকরী হয়নি। আমরা জানি, দেশের মোট জাতীয় আয়কে, মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ার জন্য মাথাপিছু আয় কম থেকে গেছে। মাথাপিছু আয়কে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানের সূচক হিসাবে গণ্য করা হয় (যদিও বর্তমানে ইউনেস্কো নির্ধারিত HDI—Human Development Index, অধিক গ্রহণযোগ্য)।

১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৯০-৯১ এই ৪০ বছর সময়ের মধ্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ৪.২১ শতাংশ। কিন্তু ওই সময়ে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ২.২৩ শতাংশ। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৪.২১ শতাংশ। ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৭-৯৮ পর্যন্ত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৫%শতাংশ কিন্তু মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার ৩.৬ শতাংশ। (এই হিসাব ১৯৮০-৮১ সালের মূল্যস্তর অনুযায়ী)।

(ii) জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার হ্রাস (Lowering the growth Rate of Population) ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার, জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারকে কমিয়ে দেয়। জনসংখ্যা বেশি হারে বৃদ্ধি পেলে, মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ কম হবে। মাথাপিছু আয় কম হলে, সঞ্চয় কম অর্থাৎ বিনিয়োগের পরিমাণও কম হয়। আমরা জানি, দেশের মোট উৎপাদন বিনিয়োগের পরিমাণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ বিনিয়োগ বাড়লে মোট উৎপাদন বা জাতীয় আয় বাড়বে। সুতরাং মাথাপিছু আয় কম হওয়ার জন্য জাতীয় আয়ও কম হয়।

(iii) খাদ্য সমস্যা (Food Problems) ঃ অর্থনীতিবিদ্ ম্যালথাস যখন তার বিখ্যাত রচনা "Essays on population" প্রকাশ করেন, তারপর থেকেই জনসংখ্যা ও খাদ্যসমস্যার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। ভারতে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ১৯২১

থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১.১১ একর থেকে কমে ০.৪৭ একর হয়েছে। অর্থাৎ ৫৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

১৯৫৬ এবং ১৯৯৭ সালের মধ্যে মোট খাদ্যশস্য (দানাশস্য এবং ডাল) উৎপাদন ৬৩ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১৭৭ মিলিয়ন টন, কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯৭ মিলিয়ন থেকে ৪৯৮ মিলিয়নে দাঁড়ায়। ফলে মাথাপিছু খাদ্যশস্য বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩১ গ্রাম থেকে মাত্র ৫১২ গ্রামে দাঁড়ায় (৩১ বছরে ১৮.৮ শতাংশ)।

(iv) জনসংখ্যা ও অনুৎপাদনশীল ভোক্তা (Population and Un-productive Consumer) ঃ ভারতের মোট জনসংখ্যাকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি—উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল ভোক্তা। উৎপাদনশীল বলতে তাদেরকে বুঝি, যাদের জাতীয় উৎপাদনে অবদান আছে। আর যাদের জাতীয় উৎপাদনে কোনো অবদান নেই, তাদের অনুৎপাদনশীল বলা হয়। অনুৎপাদনশীল ভোক্তার মধ্যে পড়ে শিশু, বৃদ্ধ এবং ১৫-৫৯ বছর বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কোনো কাজ করে না। জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বেকার সমস্যাও তত তীব্র হচ্ছে। ফলে, অনুৎপাদনশীল ভোক্তার সংখ্যা বাড়ছে। অর্থাৎ, জাতীয় উৎপাদন ভোগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, উৎপাদনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়ছে না। উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ভোক্তার সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোট জনসংখ্যার কর্মী ও কর্মী নয় এমন জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগত অনুপাত ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৬১ সালে বেকারের সংখ্যা ছিল ২৫৬ মিলিয়ন। ১৯৮১-তে সেটি হয়েছে ৪৬৪ মিলিয়ন। মোট জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ হল ০-১৪ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ কর্মী নয় এমন জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ, শিশু জন্মের হার বেশি হওয়া।

(v) জনসংখ্যা এবং বেকার সমস্যা (Population and Unemployment Problems) ঃ কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে, শ্রমিকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাই, জনসংখ্যা বৃদ্ধির অধিক হার, বেকার সমস্যাকে আরও তীব্র করে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৮০-৮৫) শুরুতে (১৯৮০ সালে) মোট বেকারের সংখ্যা ছিল ২০.৭ মিলিয়ন। অষ্টম পরিকল্পনায় (১৯৯২-৯৭) সংখ্যাটি বেড়ে হয় ২৮ মিলিয়ন। অর্থাৎ প্রতি বছর শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু পরিকল্পনাকালে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা সত্ত্বেও বাৎসরিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রমিকের কর্মসংস্থান করা যাচ্ছে না। ফলে পুরানো সংখ্যার সঙ্গে নতুন সংখ্যা যোগ হয়ে বেকার সমস্যা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

(vi) জনসংখ্যা ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের সমস্যা (Population and the Problems of Education, Medical Fecilities and Housing) ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, শিশুর সংখ্যাও বাড়ছে, ফলে, শিক্ষাগত ব্যয়ের চাহিদাও বাড়ছে। শিক্ষাখাতে ব্যয় হল একপ্রকার সামাজিক বিনিয়োগ। দেশের ছেলেমেয়েরা যদি শিক্ষিত হয়ে ওঠে, তবে দেশে ভালো শ্রমবল গড়ে ওঠে, যাতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। হিসাব অনুযায়ী ছাত্রপিছু শিক্ষাখাতে বাৎসরিক খরচ ১৪৪ টাকা। এই খরচের হিসাব (৬-১৪ বছর), যার সংখ্যা ১৫৬ মিলিয়ন (১৯৮১)। মোট খরচ হয় ২২৪৬ কোটি টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হিসাব করলে সংখ্যাটি অনেক বেশি হবে।

জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং আবাসনের ক্ষেত্রেও ব্যয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০.৫ জনসংখ্যা নীতি (Population Policy)

ভারতে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তা নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণের প্রয়োজন অবশ্যই। ১৯৮১-৯১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬১ মিলিয়ন। ২০০১ সালে মোট জনসংখ্যা হয়েছে ১০২৭ মিলিয়ন।

ভারতবর্ষ বিশ্বের প্রথম দেশ যে ১৯৫২ সালে সরকারিভাবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিন্তু এই ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে। এই পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হয় এই ভাষায়—"the objective of stabilising the growth of population over a reasonable period."

এই পরিকল্পনায় যে লক্ষমাত্রা ধার্য করা হয়, সেগুলি হল—

(i) প্রতি হাজারে জন্মহার (CBR), ১৯৭৩ সালের মধ্যে ২৫শে কমিয়ে আনা।

(ii) ১৯৭৮-৭৯ সালের মধ্যে জন্মহার ২৩ করা।

কিন্তু নানা কারণে এই দুটি ক্ষেত্রেই নির্ধারিত লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়নি।

১৯৮৩ সালে, পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত 'Working Group on Population Policy' সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি (National Health Policy—1983) গৃহীত হয়। এই নীতির লক্ষ্যমাত্রাগুলি হল ঃ

(i) ২০০০ সালের মধ্যে Net Reproduction Rate (NRR) কমিয়ে ১-এ আনা।

(ii) এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য জন্মহার ২১ এবং মৃত্যুহার জন (প্রতি হাজারে) করা হবে। তা ছাড়া শিশুমৃত্যুর হার ৬০-এর নীচে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ১৯৯৫ সালে এই লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। পরবর্তীকালে রিভিউ করে ঠিক করা হয় যে, এই লক্ষ্যমাত্রাগুলি আগামী ২০০৬-২০১১ সময়কালের মধ্যে অর্জিত হবে।

জনসংখ্যা নীতি (১৯৯৭-২০০২) ঃ নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৯৭-২০০২) গৃহীত জনসংখ্যা নীতি, ভারতের উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের পিছনে তিনটি কারণ চিহ্নিত করে—

(i) সন্তান ধারণে সক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশি হওয়ার দরুন মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব বেশি। ১৫-৪৪ বছর বয়স্ক মহিলার সংখ্যা ১৯৬৭ সালে ছিল ৭৮.৮ মিলিয়ন, সেই সংখ্যাটি বেড়ে হয়েছে ১৪৪.২ মিলিয়ন।

(ii) শিশু মৃত্যুর হার বেশি হওয়ার জন্য দম্পতিরা বেশি সন্তানের ব্যাপারে আগ্রহী থাকে।

(iii) জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলি সঠিকভাবে জনগণের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ।

নবম পরিকল্পনায় যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় সেগুলি হল—

(ক) শিশুমৃত্যুর হার ৫০ (প্রতি হাজারে) কমিয়ে আনা।

(খ) জন্মহার ২৩ (প্রতি হাজারে) করা।

(গ) TFR (Total Fertility Rate) ২.৬ করা।

২০০২ সালের মধ্যে ওই লক্ষ্যমাত্রাতে পৌঁছানোর জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেগুলি হল—

(i) নিশ্চিত মাতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ii) জন্মনিরোধক ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলা।

(iii) গর্ভপাতকে আইনি স্বীকৃতি প্রদান।

(iv) কার্যকরী পুষ্টি পরিসেবা দান।

(v) সংক্রামক যৌন ব্যাধি (STD) এবং RTI (Reproductive Tract Infection)-এর প্রতিরোধ।

এই জনসংখ্যা নীতি কার্যকর করার জন্য আরও যে বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেগুলি হল—

(i) Primary Health Centre (PHC)-গুলিকে উন্নত করা। প্রতিটি PHC-তে একজন পুরুষ ডাক্তার একজন মহিলা ডাক্তার ও একজন জনসংখ্যা বিষয়ক ডাক্তার নিয়োগের কথা বলা হয়।

(ii) মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার কমানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা সন্তান প্রসব, ANN (Auxiliary Nurse Midwive)-দের IUD (Intra Uteriam Devices) প্রতিস্থাপনে প্রশিক্ষণ, PHC-গুলিতে OT-র ব্যবস্থা করা যাতে বন্ধ্যাত্বকরণের কাজ করা যায় ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়।

(iii) জনসংখ্যা নীতিকে Total Literary Mission (TLM)-এর সঙ্গে সংযুক্তিকরণ।

(iv) দম্পতিদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী জন্মনিরোধকের ওপর গুরুত্ব দেওয়া।

(v) জন্মনিরোধকের ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিগত' উৎসাহ প্রদানের পরিবর্তে 'দলগত' উৎসাহদানের ওপর গুরুত্বদানের কথা বলা হয়।

জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০০ (National Population Policy 2000) ঃ এই নীতিতে ২০১০ সালের মধ্যে Replacement Level of Fertility-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কথা বলা হয়। তা ছাড়া ২০৪৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যা স্থিতাবস্থা (stability) অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়।

এ ছাড়া যে যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে সেগুলি হল—

(i) শিশুমৃত্যুর হার (IMR) প্রতি হাজারে ৩০শে কমিয়ে আনা।

(ii) মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার (MMR) প্রতি লাখে ১০০-র নীচে নামিয়ে আনা।

(iii) ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন—জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকরণ, বিবাহ নিবন্ধকরণ, সর্বজনীন টিকাকরণ (মা ও শিশু উভয়ের ক্ষেত্রেই)-এর ক্ষেত্রে।

(iv) মহিলাদের বিবাহের ক্ষেত্রে সঠিক বয়সে বিবাহের জন্য উৎসাহ দান।

(v) কমপক্ষে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগতভাবে সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা এবং ১০০ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করা।

জনসংখ্যা বিষয়ক জাতীয় কমিশন (National Commission on Population) নামে একটি স্থায়ী-সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার প্রধান কাজ হল জনসংখ্যা নীতি সঠিকভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা, তার দেখাশোনা করা।

১০০ কোটি টাকা নিয়ে Population Stabilization Fund তৈরি করা হয়েছে, যা জনসংখ্যা নীতির কাজকর্ম রূপায়ণে খরচ করা হবে। এই তহবিল শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, কোম্পানি, বেসরকারি সংগঠন প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হবে।

১০.৬ পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি (Family Welfare Programme)

১৯৫২ সালে ভারতবর্ষে, সরকারিভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি (Family Planning Programme) গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই কর্মসূচি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় ১৯৬৬-৬৭ সালে, এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করা হয় তা হল—

(i) পরিবার পিছু গড় শিশুর সংখ্যা ৪.২ থেকে ২.৩-এ কমিয়ে আনা।

(ii) শিশু জন্মহার ২১, মৃত্যুহার ২৯ এবং শিশু মৃত্যুর হার ৬০-এ নামিয়ে আনা।

(iii) যোগ্য দম্পত্তির (Eligible Couple) ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার ৬০%-এ পৌঁছে দেওয়া।

এই লক্ষ্যমাত্রাগুলি ২০৫০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে স্থিতাবস্থা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঠিক হয়।

কিন্তু ষষ্ঠ পরিকল্পনায় আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ায় সপ্তম পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা পুনর্বিবেচনা করা হয় এবং বাস্তবসম্মত লক্ষ্য ধার্য করা হয়। এই পরিকল্পনায় CPR (Couple Protection Rate) ৪২%

ধার্য করা হয়। এ ছাড়া ১৯৯০ সালের মধ্যে বন্ধ্যাত্বকরণের সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় ৩১ মিলিয়ন। তা ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে ব্যাপক আকার দিয়ে, এর নামকরণ করা হয় পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি। এর মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের (Mother and Child Health—MCH) ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পরিবার কল্যাণ কর্মসূচির মূল দিকগুলি হল—

(i) জনগণকে ছোটো পরিবারের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝানো এবং এই ব্যাপারে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বন করা।

(ii) পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জন্মনিরোধকের জোগান সুনিশ্চিত করা।

(iii) মা এবং শিশু স্বাস্থ্য (Mother and Child Health—MCH) কর্মসূচির সঙ্গে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচির সহযোগিতা ও সংযুক্তিকরণ।

(iv) বন্ধ্যাত্বকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান।

(v) স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি, টিকাকরণ কর্মসূচি, পুষ্টি পরিষেবা ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু মৃত্যুর হার, মা ও শিশুদের বিভিন্ন প্রকারের রোগ ইত্যাদি হ্রাস।

(vi) মহিলাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

(vii) পরিবার কল্যাণ কর্মীদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান ও আনুষঙ্গিক সুযোগসুবিধার প্রদানের মাধ্যমে কাজে আগ্রহী করে তোলা।

(viii) বিবাহের বয়স বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ।

(ix) আইনস্বীকৃত গর্ভপাত সম্পর্কে দম্পতিদের সঠিক তথ্য জানানো।

(x) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ।

(xi) পরিবার পরিকল্পনার জন্য আরও গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে, বিশেষ করে অস্থায়ী (Non-permanent) পদ্ধতির ওপর। এর সঙ্গে আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বিচার করতে হবে। যাতে পরিবার পরিকল্পনার উদ্যোগ ব্যাহত না হয়।

১০.৭ অনুশীলনী

(১) ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলি আলোচনা করুন।

(২) জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, অর্থনীতির ওপর কীরূপ প্রভাব লক্ষ করা যায়?

(৩) ভারতে শিশু জন্মের হার বেশি হওয়ার কারণগুলি কী কী?

(৪) ভারতের জনসংখ্যা নীতি সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যাধর্মী প্রবন্ধ লিখুন।

(৫) পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি কী, কেন এবং কীভাবে সে সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

১০.৮ গ্রন্থপঞ্জি

(i) Indian Economy : R. Dutt & Sundaram

(ii) Indian Economy : Mishra & Puri

একক ১১ ❑ কৈশোর অপরাধ

গঠন

১১.১ ভূমিকা

১১.২ কৈশোর অপরাধের ধারণা

১১.৩ প্রকৃতি ও পরিণাম

১১.৪ বৈশিষ্ট্য

১১.৫ সমস্যার বিস্তৃতি

১১.৬ উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ

১১.৭ অপরাধীদের পরিচর্যার নানা উপায়

১১.৮ কিশোর অপরাধীর তত্ত্বাবধানমূলক প্রতিষ্ঠান

১১.৯ কৈশোরকালীন অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

১১.১০ অনুশীলনী

১১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ ভূমিকা

ভারতবর্ষের মতো বহু ভাষাভাষি, বহু জাতিভুক্ত মানুষের দেশে হাজার রকমের সমস্যা দেখা দেয়, কৈশোর অপরাধ তাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যার ধরন এতটাই জটিল যা দেশের সাধারণ নাগরিকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যেভাবে শহর ও নগরায়ণের প্রবণতা বাড়ছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে কৈশোর বয়সে অপরাধের প্রবণতাও বেড়ে চলেছে। ব্যাপকহারে সংঘটিত সামাজিক পরিবর্তন ও আনুষঙ্গিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমস্যা মোকাবিলার মতো পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও পরিকল্পনা না থাকার ফলে এই সমস্যাও গুরুতর আকার ধারণ করেছে। বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের সকলের কাছেই গভীর উদ্বেগের ও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মোকাবিলা করতে হলে অনতিবিলম্বে উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

১১.২ কৈশোর অপরাধের ধারণা

আইনগত দৃষ্টিভঙ্গিতে কৈশোর অপরাধ বলতে আমরা বুঝি "একটি শিশু আইন লঙ্ঘন করলে এবং আইনত দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করলেই তা হবে কৈশোর অপরাধ।" অন্য অর্থে একজন কিশোর অপরাধী হবে সেই যার কাজকর্ম তার যত্ন ও শিক্ষাদানের জন্য দায়বদ্ধ অভিভাবক, শিক্ষক ও অন্যদের কাছে বিপদসঙ্কেত ও উদ্বেগের কারণ হবে। উদয়শঙ্করের ভাষায় কৈশোর অপরাধ হল "একটা বিদ্রোহ, ক্ষোভের প্রকাশ যার লক্ষ্য কিছু ধ্বংস করা বা ভেঙ্গে ফেলা বা পরিবেশটা পাল্টে দেওয়া।" ফ্রায়েডল্যাণ্ডারের মতে "এটা কৈশোর অভব্যতা যা আইনগতভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে।" সিরিল বার্ট (Cyril Burt)-এর মতে এটা সমাজবিরোধী প্রবণতা যা প্রথাগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে বা না করেই মোকাবিলা করা যেতে পারে। উইলিয়াম এইচ. সেলডম (William H. Sheldom)-এর ধারণায় এটি হলো সঙ্গত আশা-প্রত্যাশার বাইরে কোন অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ। এমন এক ধরনের কাজ যা বড়রা করলে তা অপরাধ বলেই বিবেচিত হতো। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে কৈশোর অপরাধী সেই যার কাজকর্ম সমাজের স্বাভাবিক রীতি-নীতির পক্ষে বেমানান। সে এমন ভূমিকা পালন করে যা সমাজের কাছেই বিপদসঙ্কেত। প্রথাগতভাবে বলা যায় যে, যে কোন লিঙ্গের ৭ বছর থেকে ১৮ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ ১৮ বছর পেরিয়ে গেলে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তারা আর শিশু থাকে না। অন্যদিকে ৭ বছর বয়সের নীচে শিশুদের কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল সে সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে না। বয়সের এই মানদণ্ড কোথাও কোথাও একটু ভিন্ন থাকতে পারে। দেশকাল ভেদে সেই তারতম্য থাকা স্বাভাবিক।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার যুগে আমরা কাউকে অপরাধী বলতে পারি না। তার কাজকর্মকে অপরাধীর আচরণ হিসাবে বলতে পারি। তারা কোন নির্দিষ্ট ধরনের মানবজাতি নয়। স্বাভাবিক আশা-প্রত্যাশার মধ্যে বেড়ে ওঠা অন্য দশজনের মতো তারাও স্বাভাবিক মানুষ। শুধু তারতম্য ঘটে কখনো কখনো তারা যখন সমাজের অন্যদের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে ব্যর্থ হয়। কৈশোর অপরাধের ধারণায় এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে। এখন বলা হয়ে থাকে যে কৈশোর অপরাধ কোন শারীরবৃত্তীয় উপাদানও নয় আবার মানসিক ভারসাম্যহীনতাও নয়। এই ধরনের শিশুদের আচরণগত সমস্যাই মূলত দায়ী।

১১.৩ প্রকৃতি ও পরিণাম

কৈশোর অপরাধের প্রবণতা নানাবিধ। সকল অপরাধীর ধরন যেমন এক নয়, তেমন বিভিন্ন কিশোর-কিশোরীর অপরাধ প্রবণতাও বিভিন্ন হয়। যেমন কারও কারও প্রবণতা থাকে স্কুল থেকে পালিয়ে যাওয়া। সে স্কুলের কাজকর্ম বা বিদ্যাচর্চার মধ্যে কোন আনন্দ বা উৎসাহ পায় না বলেই তার মধ্যে স্কুল থেকে পালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস বাড়ে। কখনো কখনো পরিবেশগতভাবে বা কখনো সেই স্কুলের নানান বিষয়ের পেছনে বেশী প্রভাব ফেলে থাকে। ইলিয়ট ও মেরিল (Elliot ও Merill) এই স্কুলছুট প্রবণতাকে কৈশোর অপরাধের কিন্ডারগার্টেন বলে চিহ্নিত করেছেন। যদি স্কুল তার নিয়মনীতি না থাকা, সঠিকভাবে দেখভাল না করা, শিক্ষকদের অকারণ উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি, বসার জায়গা ঠিকভাবে না থাকা, পড়ানোর কোন চর্চা না থাকা প্রভৃতি নানান কারণে শিশুদের ধরে রাখতে না পারে তাহলে সেই স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে স্কুলছুট-এর প্রবণতা বাড়বে। এমনকি পারিবারিক পরিবেশ, ভালো বন্ধু-বান্ধবী না থাকা, মনের মধ্যে খেলাধুলার সাধ না থাকা, পড়ার খুব চাপ থাকা ইত্যাদি কারণেও অনেক কিশোর-কিশোরীকে স্কুলছুট হতে বাধ্য করে।

ভবঘুরে বা যাযাবরত্ব কৈশোর অপরাধের আরেক প্রকৃতি। সংশ্লিষ্ট শিশুর মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ করে কোন নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই এই প্রবণতা দেখা দেয়। এই প্রবণতা সাধারণত ৮ বছর বয়সী বা তার কাছাকাছি সময়ে সবচেয়ে বেশী হয়। এই ধরনের শিশুদের সাধারণত কোন যত্ন নেওয়া হয় না বা পারিবারিক দিক থেকে অবহেলিত। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই শিশুরা কোন না কোন ভগ্ন পরিবার থেকে বা অগোছালো পরিবার থেকে আসে।

আরও এক ধরনের প্রবণতা কৈশোর অপরাধীর মধ্যে দেখা যায় যা হলো জুয়া খেলা। কৈশোরের একেবারে গোড়ার দিকে এই প্রবণতা আসে। তার অজান্তেই তার মধ্যে এই অভ্যাস শক্ত ভিত তৈরি করে দেয়।

উপরোক্ত তিন প্রকৃতির কৈশোর অপরাধ ব্যতীত অন্য ধরনের অপরাধও কৈশোরে সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন, কেউ কেউ ভিক্ষা করতে শুরু করে এবং পরবর্তীকালে ভিক্ষুক হিসাবে স্বীকৃত হয়। কেউ কেউ অত্যন্ত অশালীন কথাবার্তার চর্চায় মগ্ন হয় এবং পরবর্তীকালে তার বিপরীত লিঙ্গের প্রতি অভব্য আচরণে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া চুরি, মদ্যপান, মাদক ব্যবহার, পতিতালয়ে যাওয়া, খুন, ধর্ষণ, রাহাজানির মতো নানান অসামাজিক কাজে কৈশোরে কেউ কেউ হাত পাকায়।

১১.৪ বৈশিষ্ট্য

এই ধরনের কৈশোর অপরাধের নানান রকম বৈশিষ্ট্য থাকে। তাদের মধ্যে কয়েকটি নিচে তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন—

★ পরোয়া না করার আচরণ

★ সংযত আবেগ

★ মেলামেশায় ও কথোপকথনে বাছবিচার

★ বাড়ির বাবা-মা/অন্য লোকজন/প্রতিবেশী/শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এড়িয়ে চলা।

★ পড়াশোনায় ভালো না লাগা।

★ এলোমেলোভাবে জীবনযাপন।

★ সঠিকভাবে ঘুম না হওয়া।

★ অসচ্ছল বা উস্কো-খুস্কো দেখানো।

★ ছোট ছোট সঙ্গীসাথী গোষ্ঠীতে ঘনিষ্ঠতা।

★ অর্ধেকভাবে আয় ও নেশা করা, জুয়াখেলা, যৌন ব্যবসায় মেতে যাওয়া।

★ বাড়ির বাইরে দিন ও রাত কাটানো প্রভৃতি।

১১.৫ সমস্যার বিস্তৃতি

একথা মনে রাখা দরকার যে কৈশোর অপরাধীরা নানারকমের অসামাজিক ও সমাজবিরোধী কাজকর্মের সাথে যেমন চুরি, যৌন অপরাধ, স্কুলছুট, অত্যাচার, পাচার প্রভৃতির সাথে যুক্ত। কিন্তু এই অপরাধগুলোর প্রত্যেকটাই সমান গুরুতর হবে এমনটা সাধারণত হয় না। অন্যদিকে প্রতিটি অপরাধীর আচরণও একইরকম হয় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কৈশোর অপরাধীর আচরণ বিষয়ক একটি গবেষণার প্রতিবেদনে চুরি সংক্রান্ত অপরাধ সবার আগে এবং দৈহিক নির্যাতনকে সবার শেষে ক্রমানুসারে চিহ্নিত করা হয়েছে। উদয়শঙ্করের মতে দিল্লির সমস্ত কিশোর অপরাধীর মধ্যে ৭৭·৭% (মোট ১৪০ জনের মধ্যে) কোন না কোন চুরির সাথে জড়িত।

যাই হোক, কৈশোর অপরাধ বর্তমান সমাজে এবং সরকারী ব্যবস্থার সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। অনেকে মনে করছেন যে, এই সমস্যা এমন গভীরে প্রবেশ করেছে যে এর থেকে সমাধানের পথ বার করা খুবই কঠিন। কেউ কেউ মনে করছেন এখনও সময় আছে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার বা সমস্যা মোকাবিলা করার। সমস্যার আদৌ সমাধান করা যাবে না তেমন নয়। ১৯৭০-এর কলকাতা শান্ত হবে কেউ কখনো ভাবতেও পারেন নি। সেখানে আর্থিক, সামাজিক এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব তা কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেছে। ঘটেছে সকলের কল্পনার বাইরে।

একই রকমভাবে কৈশোর অপরাধও মোকাবিলা করা সম্ভব। যদি কোন দেশ ৬৫% সাক্ষরতার হার নিয়েও পরিবার পরিকল্পনার মতো কর্মসূচীকে চূড়ান্ত সফল রূপদান করতে পারে, অর্ধেকেরও বেশি কৃষক নিরক্ষর হয়েও কৃষিবিপ্লব ঘটাতে পারে, কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি রূপায়ণ ঘটাতে পারে তাহলে সেই দেশ তার সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর যৌথ প্রচেষ্টায় কৈশোর অপরাধ মোকাবিলা করতে পারবে না। একথা কেউ মানতে চায় না।

১১.৬ উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ

এই সমস্যা সৃষ্টির পেছনে নানান কারণ আছে। কৈশোর অপরাধ ঘটার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেসব কারণ থাকে তার কয়েকটি এখানে আলোচনা করা হল। সবচেয়ে বড় কারণ হিসাবে পরিবার এবং সমষ্টির নানান দোষ-ত্রুটি থেকেই এই অপরাধ দানা বাঁধতে শুরু করে। যাই হোক, এই সমস্যা সৃষ্টির পিছনে মূল কারণগুলো হল নিম্নরূপ ঃ

(ক) **দারিদ্র্যতা** ঃ বেআইনী ও অসামাজিক কাজ সম্পর্কিত কৈশোর আচরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল দারিদ্র্যতা। আমাদের দেশে এর গভীরতা এবং বিস্তৃতিও উদ্বেগজনক। মহাত্মা গান্ধী একে শাশ্বত বাধ্যতামূলক অবস্থা বলেই অভিহিত করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে, কৈশোর অপরাধের প্রবণতা শহুরের দারিদ্র্য অধ্যুষিত বস্তি অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। ডঃ আর. কে. মুখার্জীর কথায়— এখানেই এই সমস্যা লক্ষ্যণীয়ভাবে ঘটে তার কারণ শিশু অবস্থাতেই এর জীবাণু প্রবেশ করে। গ্লেক এবং গ্লেক (Glueck and Glueck) মন্তব্য করেছেন যে, ৬৫% কৈশোর অপরাধী অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলো থেকেই আসে। তবে দেখা গেছে, বর্তমানকালে শহরের দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারগুলো থেকেই কৈশোর অপরাধী আসে, তা নয়। জীবনের প্রতিটি স্তর থেকেই তারা অপরাধের

জগতে প্রবেশ করে। বিস্ময়ের কথা এই যে, আজকাল তথাকথিত শহুরে বিত্তশালী ও শিক্ষিত পরিবারগুলো থেকেই কৈশোর অপরাধীর একটা বড় অংশ আসছে।

(খ) **সুযোগ-সুবিধার অসাম্যতা ঃ** অন্য অনেক কারণের পাশাপাশি স্বাভাবিকভাবে জীবনধারণের জন্য এবং ভবিষ্যৎ জীবনে বৈধভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অসাম্যতাও একটা বড় কারণ। যার ফলে হতাশা ও মানসিক অবসাদের কারণে অবৈধ কাজকর্মের প্রতি আসক্তি বাড়ছে। মার্টন (Merton) বলেছেন, "সাংস্কৃতিকভাবে গড়ে ওঠা আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিকভাবে সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য গঠিত নানান উপায়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার এটা একটা লক্ষণ।"

(গ) **অসংগঠিত পরিবার ঃ** যে কোন মানুষেরই পারিবারিক বাতাবরণ তার আচরণ গঠনে সাহায্য করে। মজবুত পারিবারিক বন্ধন থেকেই তার চরিত্র গঠন হয়। মনস্তত্ত্ববিদদের ধারণায় অসংগঠিত পরিবারের একজন মানুষ নিজেকে অপরাধের দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য হয় তখনই, যখন তার উপর প্রতিনিয়ত অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। এমনকি সে ভয়ানক হিংস্রও হয়ে উঠতে পারে। একটা শিশুর ক্ষেত্রে তার শারীরিক বিষয়ের থেকে মানসিক বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরী। পারিবারিক আবেগ ও অনুশোচনা যদি শিশুর মানসিক অবস্থার পরিপন্থী হয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে অপরাধ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। আমরা শিশুর শারীরিক বিষয়ের প্রতি অধিক যত্নশীল হই। কিন্তু তার মানসিক বিষয়ের প্রতি বা পারিবারিক সুসম্পর্কের প্রতি খেয়াল সেভাবে রাখি না। শিশুর নিরাপত্তাবোধ না থাকলে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতা আসে না। স্বাভাবিকভাবেই ভগ্ন-পরিবরার শিশুর জন্মাবস্থা থেকেই আচরণগত সমস্যার কারণ তৈরি করে থাকে। যদিও এখন 'বাড়ি' শব্দটির ধারণায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। অতীতের 'হোম' থেকে আজকের বাড়ি'র মধ্যে একটা বন্ধনের কথা বলা হয়েছে। দেখা গেছে প্রায় ৫০% কৈশোর অপরাধী পারস্পরিক সম্পর্কের দিক থেকে ভাঙা বাড়ি থেকেই আসে। সমষ্টির লোকজন যেখানে পারস্পরিক খবরাখবর রাখেন না, তাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয় যা পরবর্তীকালে শিশুদের জীবনে অপরাধের ঘটনায় যুক্ত হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়।

(ঘ) **সঙ্গী-সাথীর দৈন্যতা ঃ** শিশুরা জন্ম থেকেই প্রকৃতির নিয়মে তার সমবয়সী সঙ্গী-সাথীর ভক্ত হয়। সকলেই যে সম-মনোভাবাপন্ন সঙ্গী পায় তা নয়। দেখা গেছে অসৎ মনোভাবাপন্ন ও বাউণ্ডুলে প্রকৃতির সঙ্গী-সাথী পেয়ে এবং তার প্ররোচনায় অনেক শিশু একটু বড় হয়ে নানান রকম অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হয়। Glueck and Glueck দেখেছেন যে ৭২% ঘটনায় দুজন, তিনজন

বা তার বেশী কিশোর-কিশোরী যৌথভাবে অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। ভারতবর্ষেও কৈশোর অপরাধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে দলবদ্ধভাবে বা একাধিক দল মিলেই অপরাধ ঘটানো হয়েছে। শুধু যে অসৎ সঙ্গী থেকেই অপরাধীর প্রবণতা আসে এমনটা নয়, পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট শিশুর আচরণ গঠনও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসাবে কাজ করে থাকে।

(ঙ) **সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ঃ** কৈশোর অপরাধের এটাও অন্যতম একটি কারণ। বিভিন্ন জনের সাথে মানিয়ে চলতে না পারা ও অবসাদজনিত মানসিক অবস্থা একজনকে কোন একটি মনোভাব থেকে বিপরীত মনোভাবাপন্ন করে দিতে পারে। সমাজতত্ত্ববিদরা বলেছেন এই অবস্থা থেকে অপরাধ জন্ম নিতে পারে। তাদের মতে সমাজের একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর সঙ্গে ব্যক্তির যোগাযোগ বা ভাব বিনিময় যার থেকে এই ধরনের অপরাধ ঘটানোর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

(চ) **অবহেলা বা বাতিল করা ঃ** মা-বাবা/অভিভাবকের দ্বারা শিশুদের অবহেলা বা বাতিল হওয়া থেকেও এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই আচরণের অঙ্গ হলো নিষ্ঠুর ব্যবহার, অত্যধিক কড়া শাসন, নানা রকমের শাস্তিদান প্রভৃতি যা শিশুদের মনে তাদের মা-বাবা বা অন্য অভিভাবকের প্রতি হিংস্রভাব জাগিয়ে দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে সাধারণভাবে বিভিন্ন জায়গায় (যেমন, স্কুল, কাজের স্থলে) কর্তৃপক্ষের উপর ভয়াবহ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ক্রমে মিথ্যাবাদী হয় এবং স্কুলছুট হয়। এভাবে উপরোক্ত ধরনের আচরণের ফলে শিশুদের মনে অপরাধের ভাবনা দানা বাঁধে।

এছাড়াও গঠনমূলক বিনোদন, সৃজনশীলতার অভাব, সুস্থ মানসিকতার প্রতিবেশী না থাকা, সমস্যাসঙ্কুল শিক্ষাব্যবস্থা, তরুণ বয়সে বিপজ্জনক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান প্রভৃতি নানারকম কারণেও কিশোর অপরাধীর প্রবণতা বেড়ে চলেছে। উপরোক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ ব্যতীত ব্যক্তিগত নানান বিষয়ও থাকে। যেমন—মানসিক বিকাশে বাধা, ভাবাবেগের প্রভাব এবং বুদ্ধিমত্তার (Intelligence Quotent) স্তর পশ্চাৎপদগ্রস্ত-এর মতো বিষয়গুলিও এই সমস্যার পেছনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

১১.৭ অপরাধীদের পরিচর্যার নানা উপায়

জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজ্য ও জেলাস্তরে এবং কখনো কখনো জেলাস্তরের নীচেও কর্মরত নানান স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কৈশোর অপরাধের মোকাবিলায় বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই সমস্যার ক্রমবর্দ্ধমান প্রবণতা ঠেকাতে সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পুলিশ

প্রশাসনও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় হলেও কৈশোর অপরাধের নানান প্রকৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর ভাবনাচিন্তার দরকার। সমষ্টির সামাজিক গঠনপ্রণালী ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এই সমস্যার শেকড় বিস্তৃত। সুতরাং শুধুমাত্র পুলিশ, প্রশাসন বা আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। এই সমস্যার প্রতিকারের জন্য বহুমুখী ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্যার মূলক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করা এবং 'একের জন্য বহুজন' সহায়ক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সূত্র বার করা দরকার।

বেশ কিছুদিন আগে থেকে ভারতে সামাজিক প্রতিরোধ কর্মসূচি (Social Defence Programme) গ্রহণ ও রূপায়ণের কাজ চলছে। কৈশোর অপরাধের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও এই কর্মসূচিতে ভাবা হয়েছে। কিন্তু ঘটনার উপর শুধুমাত্র গবেষণা ও নানান গতিপ্রকৃতির বিষয় চিহ্নিত করে রেখে দিলেই কাজ হয় না। সমস্যাটির সবদিক সঠিকভাবে বিবেচনা করে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার। সেই কাজ করতে গেলে কৈশোর অপরাধ প্রতিরোধ, প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়গুলি বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে।

অন্যদিকে, বিশেষ বিশেষ কিছুক্ষেত্রে শাস্তিবিধান-এর মাধ্যমেই যে সমাজ সজাগ হবে এবং এই অপরাধ থেকে মুক্ত হবে, এমনটা ভাবা যায় না। যদি অপরাধীকে পুনরায় শিক্ষাদান ও হাতের কাজের নানান বিষয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তাহলে অপরাধীর পাশাপাশি সমাজেরও কিছুটা স্বার্থপূরণ হয়। যার ফলে, সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই ধরনের অপরাধীর পুনর্বাসন ও স্বাবলম্বনের পাশাপাশি স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তার অনুপ্রেরণা জাগে। আজকের শহুরে জীবন নানান ঘাত-প্রতিঘাতে ভরা। বিশেষ করে মহানগর জীবনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিত্যনতুন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কৈশোর অপরাধ তার মধ্যে অন্যতম একটি সমস্যা। যার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ খুবই দরকার। একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত তার নতুন প্রজন্মের নাগরিক বিশেষ করে শিশুদের পরগাছা-প্রবণতা থেকে মুক্ত করা। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে দেশের নগরাঞ্চলে গজিয়ে ওঠা কৈশোর অপরাধের মতো সমস্যার মোকাবিলায় সর্বতোভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার। সকলের সর্বোত্তম প্রচেষ্টায় সমস্যার মোকাবিলা সম্ভব হতে পারে। এখানে সমস্যার সমাধানের কথা মাথায় রেখে কতকগুলি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—

★ পিতামাতা/অভিভাবকের সবার আগে শিশুদের মনের গুণগত বিকাশ ও শারীরিক মানসিক বিকাশের জন্য সব রকমের উদ্যোগ নেওয়া উচিত যাতে শিশু তার গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পায়।

★ সংশোধনমূলক পরিষেবা শিশুর পাশাপাশি তার পরিবারের জন্যও প্রদান করা যাতে শিশুটি তার পরিবার থেকে বাইরে গিয়ে পরিষেবা লাভ ও পরিবারের থেকে বঞ্চনার শিকার না হয়।

★ যে সব পরিবার অসহায় ও নানান সমস্যায় জর্জরিত, তাদের প্রতি সমাজের দায়বদ্ধতা থাকা এবং প্রয়োজনে সমাজ যেন তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তা দেখা।

★ অপরাধ প্রবণতা রোধের জন্য পিতামাতা ও শিশুর মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা একান্ত দরকার। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে এর প্রভাব সীমাহীন। এই লক্ষ্যে পিতামাতাকে সঠিক শিক্ষাদানের উদ্যোগ নেওয়া জরুরী।

★ তরুণ অপরাধীকে 'অপরাধী' হিসাবে বিবেচনা না করে প্রতিকারমূলক পরিচর্যা দেওয়া দরকার। খাঁচায় বন্দী করা নয়, তাদের সংশোধনের উদ্যোগই কাম্য।

★ বাড়ি, বিদ্যালয় ও সমাজে চরিত্রগঠনমূলক কাজকর্মের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।

★ শিক্ষালাভ বাধ্যতামূলক করা এবং শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ঘটানো যাতে শিশুরা দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হওয়ার সুযোগ পায়। সেজন্য শিক্ষা-সূচিতেও পরিবর্তন আনা দরকার।

★ শিশুদের উপর নানা রকমের অপরাধমূলক কাজকর্মের জন্য দায়ী প্রাপ্ত বয়স্কেরা যাতে কঠিন সাজা পায় তা দেখা। সেই মানুষদের বা তাদের গোষ্ঠীর হাত থেকে শিশুদের উদ্ধার করা একান্ত জরুরী।

★ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া।

★ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় সৃজনশীল কাজকর্মের সুযোগ তৈরি করা।

এখানে আরও উল্লেখ করা দরকার যে, কৈশোর অপরাধের মতো সমস্যার আশু সমাধান হওয়া বা সেই উদ্দেশ্যে অপরাধীর জীবন ও সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে বাস্তবোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার দরকার হয়। এটা ঘটনা, এই কাজে সংযুক্ত পরিকল্পনাকারী, নীতি নির্দ্ধারক, সমাজবিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট সমাজ এবং পরিবারের কাছে এই বিষয়টি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনও সমস্যার তীব্রতা যে স্তরে বিরাজ করছে তা মোকাবিলা করা সম্ভব হবে যদি সংশ্লিষ্ট সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। তা না হলে উন্নত দেশগুলির মতো এক চিরাচরিত সমস্যা হিসাবে কৈশোর অপরাধ আমাদের দেশে বিরাজ করবে।

১১.৮ কিশোর অপরাধীর তত্ত্বাবধানমূলক প্রতিষ্ঠান

কোন এক সময় কিশোর অপরাধীকে যখন পুলিশ চিহ্নিত করে, দেরী না করে তাকে ধাপে ধাপে প্রথমে কোন সংস্থার হোমে ও পরে অন্য কোন আশ্রয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এই ধরনের সংস্থাগুলির মধ্যে জুভেনাইল কোর্ট, শর্ট্ স্টে হোম, রিমাণ্ড হোম, সার্টিফায়েড স্কুল, অক্সিলিয়ারী হোম, ফষ্টার হোমস, সক্ষম ব্যক্তির সংস্থা (Fit Persons Institutions), অবহেলিত শিশুদের রক্ষণাগার (Uncared Children Institutions), সংশোধনমূলক বিদ্যালয় (Reformatory School) ও Borstal Institutions প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিশোর আদালত (Juvenile Court) একটি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের আদালত। কিশোর অপরাধীকে গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশকে তাকে (শিশুকে) এই আদালতে হাজির করাতে হয়। এই আদালতে ১৮ বছরের নীচের বয়সের শিশুদের নিয়ে বিচার হয় বলে এর কাজকর্ম সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এখানে সাদা পোশাকে পুলিশ হাজির হয়। বিচার চালানোর পদ্ধতিও আলাদা ধরনের। বিচার চলাকালীন সাধারণ লোকজনকে ভেতরে থাকতে দেওয়া হয় না। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিচারক এখানে দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। যদিও এই ধরনের আদালতের সংখ্যা খুবই কম। সাময়িক আশ্রয় (Short Stay Home) ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় ১৯৬৯ সালে। এটি রূপায়ণের জন্য ১৯৯৯ সালে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের কাছে এই প্রকল্প স্থানান্তরিত হয়। মূল উদ্দেশ্য হল পারিবারিক ও সামাজিক নানান ঘাত-প্রতিঘাতে বিপন্ন বালিকা বা মহিলাদের সুরক্ষা প্রদান ও পুনর্বাসনের সুযোগ বাড়ানো। ২০০৪-২০০৫ সালে এই আশ্রয়/হোমের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১০·২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

বিচারাধীন কিশোর অপরাধীর হাজত (Remand Home) এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যেখানে অপরাধীদের অপরাধ সংক্রান্ত অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তাদের নিরাপদে রাখার পাশাপাশি উপযুক্ত কর্মীদের সাহায্যে তাদের শ্রেণীবিভাজন ও পর্যবেক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়। কখনো কখনো তাদের কিছুদিন রাখার পর আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। এই হোমের সংখ্যা খুবই কম। সরকারী ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ প্রচেষ্টায় এইসব হোম পরিচালিত হয়ে থাকে। সাধারণত প্রতিটি কিশোর আদালতের সঙ্গে কমপক্ষে একটা রিমান্ড হোম-এর ব্যবস্থা থাকে।

শংসায়িত বিদ্যালয় (Certified School) মূলত শিশুদের পরিচর্যা করার জন্যই গঠিত হয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী দীর্ঘকালীন বা সাময়িক পরিচর্যার ব্যবস্থা এখানে করা হয়। যদিও সরকার সরাসরি নানান স্কুল পরিচালনা করে থাকে, তবুও এই ধরনের বিদ্যালয় অনুদানমূলক সহায়তার মাধ্যমে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই পরিচালিত হয়। ন্যূনতম ৬ মাস ও সর্বাধিক তিন বছরের পড়ার সুযোগ থাকলেও শিশুরা এই সময়কালে প্রয়োজনে সাধারণ শিখা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা অর্জনে যুক্ত হতে পারে। স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে শিশুদের বিদ্যালয় থেকে মুক্ত করে দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। এই মুক্তির পরবর্তী স্তরে প্রবেশন অফিসারের নজর রাখার ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে।

কিশোর অপরাধীদের দেখাশোনার জন্য আরও একটি ব্যবস্থা হল সহায়ক হোম (Auxiliary Home). যে সব কিশোর অপরাধীর দণ্ডবিধান হয়, তাদেরকেই কিছুদিনের জন্য এই হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। শংসয়িত বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে এই হোমগুলো গঠন ও পরিচালনের ব্যবস্থা করা হয়। একজন সমাজকর্মী এই হোমের ছেলে/মেয়ে অপরাধীর চালচলন ও ব্যবহার নিরীক্ষা করবেন এবং উপযুক্ত প্রতিবেদনসহ তাদের শংসয়িত স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

লালনপালন হোম (Foster Home) সাধারণত ১০ বছর বয়সের নীচে শিশু-অপরাধীদের যত্ন ও লালনপালনের জন্য গঠন করা হয়। যতদিন পর্যন্ত কৈশোরকালীন অপরাধের বিচারালয় ঐ শিশুর অন্য কোনভাবে পরিচর্যার বিষয়ে না সন্তুষ্ট হয়, কোন শিশু অপরাধীকেই ততদিন কোথাও পাঠানো হয় না। সরকারী সাহায্য নিয়ে সাধারণত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি এই ধরনের হোম পরিচালনার কাজ করে থাকে।

সক্ষম ব্যক্তির সংস্থা (Fit Persons Institution) সাধারণত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে শিশুদের গ্রহণ করা, নিরাপত্তাদান করা, অত্যাচার/শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা এবং সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করার জন্যই গড়ে তোলা হয়। অবহেলিত শিশুদের রক্ষণাগারে (Uncared Children Institution) যে সব শিশুর অপরাধ করার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে বা কোন অপরাধ করার অব্যবহিত আগে থেকেই তাদের যত্ন ও লালনপালনের ব্যবস্থা করে থাকে। বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত এইসব সংস্থায় থাকার ফলে অপরাধপ্রবণ শিশুদের সঠিকভাবে জীবনযাপনের পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

অন্য আরও দুই ধরনের সংস্থা মূলত সংশোধনমূলক বিদ্যালয় (Reformatory School) এবং কারারুদ্ধ সংশোধন প্রতিষ্ঠানের (Borstal Institution) মাধ্যমে কিশোর অপরাধীদের পরিচর্যার বন্দোবস্ত করা হয়। দেখা গেছে, কখনো কখনো ১৫ বছর বয়সের কম তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অপরাধ

করার একটা প্রবনতা আসে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে ৩ বছর থেকে ৭ বছর পর্যন্ত তাদের রাখার সুযোগ দেওয়া হয়। সংশোধনমূলক বিদ্যালয়ে তাদের রাখার ফলে তারা লেখাপড়া ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সুযোগ পায় এবং সুন্দর পরিবেশে নিজেদের মনোভাব পরিবর্তনের সুযোগ পায়। কারারুদ্ধ সংশোধন প্রতিষ্ঠানে ১৬ বছর থেকে ২১ বছর বয়সী প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের রাখার ও সংশোধনমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক বিকাশের বন্দোবস্ত করা হয়। কখনো খোলামেলা পরিবেশে কখনো রুদ্ধদ্বার অবস্থায় এই সংশোধনমূলক কাজকর্ম করা হয়ে থাকে। কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে এইসব সংস্থা থেকে অপরাধীদের মুক্ত করার দিনক্ষণ ধার্য্য করা হয়।

১১.৯ কৈশোরকালীন অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

একথা সর্বজনগ্রাহ্য যে সুস্থ সমাজ গঠন করতে গেলে কৈশোর অপরাধের মতো সমস্যার সমাধান বা নির্মূল করা দরকার। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই সমস্যার প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। এর জন্য যে সব আইনগত বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে তা সঠিকভাবে বলবৎ হলেই অনেক কাজ হতে পারে। আইনরক্ষক ও আইন চর্চাকারীদের গভীর মনোযোগ এবং আইনরক্ষায় কঠোরতা একান্ত দরকার। ১৯৬০ সালে প্রবর্তিত (সংশোধিত হয় ১৯৭৮ সালে) শিশু আইন এবং ২০০০ সালে প্রবর্তিত কৈশোর অপরাধী সুরক্ষা আইন ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্য বলবৎ করলেও বহুলাংশে ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে গেছে। এই ধরনের আইন বলবৎযোগ্য করার প্রক্রিয়া যাতে আরও মজবুত ও শক্তিশালী হয় তার জন্য পরিকল্পনাকারী ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। পরামর্শ দান কেন্দ্র, মানসিক পরিচর্যা কেন্দ্র (Mental Care Centre), শিশুর পথ প্রদর্শন কেন্দ্র (Child Quidance clinic) ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রগুলো যাতে আরও বেশি নিষ্ঠা ও গুরুত্ব সহকারে কাজ করে সে ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান নানান সংস্থা বা বিভাগগুলো তাদের সাধারণ কাজকর্মের পাশাপাশি এই সমস্যার সুষ্ঠু মোকাবিলায় উদ্যোগ নেবে। যদিও সংশ্লিষ্ট পরিবার সচেতন ও সজাগ থাকলে গোড়াতেই এই সমস্যা নির্মূল করা সম্ভব হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের ষষ্ঠ অধিবেশনে এই মর্মে সকলের সহমতের ভিত্তিতে বলা হয়—"কৈশোরকালীন অপরাধ প্রতিকারে শক্ত পারিবারিক বন্ধনের কোন বিকল্প নেই। সরকারী হস্তক্ষেপের বদলে সমষ্টিভিত্তিক কর্মসূচি এক্ষেত্রে বেশি সাফল্য এনে দেয়। বিপথগামী তরুণ প্রজন্মকে তাদের পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচর্যা করাই সবচেয়ে বেশি ফলদায়ক হয়। তাদের কৈশোর আদালতে পাঠালে সেই পথে

আশানুরূপ সাফল্য সবসময় আসে না।" অধ্যাপক জে. সাহা (Prof. Smt. J. Shah)-র মন্তব্য উদ্ধৃতি করে বলা যায়—"স্থানীয় প্রতিবেশী স্তরে কৈশোর অপরাধের প্রতিরোধ সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে করা যায়।" সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সরকার, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিদ্যালয়সমূহ, পাড়া-প্রতিবেশী এবং পরিবারের সদস্যদের সামগ্রিক প্রয়াসেই এই সমস্যার প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। কখনো আকর্ষণীয় বিদ্যালয় কর্মসূচি গ্রহণ, সংঘবদ্ধ সৃজনশীল কর্মসূচি গ্রহণ, স্নেহ-ভালোবাসার বাতাবরণ তৈরি করা, পরামর্শদানের ব্যবস্থা করা প্রভৃতির মাধ্যমেও এই সমস্যার প্রতিকার হতে পারে। শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে এইসব বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকে। কৈশোর অপরাধ প্রতিকারের জন্য গৃহীত কর্মসূচি-সুস্থ পরিবার গঠন, সংহতিপূর্ণ সামাজিক অবস্থা, সহায়ক শিক্ষালাভের সুযোগ, প্রশিক্ষণ ও সৃজনশীল কাজকর্মের উপর ভিত্তি করে গৃহীত হলে শিশুমনে মূল্যবোধ ও আইনগত বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গঠনের পথ প্রশস্ত হয়।

১১.১০ অনুশীলনী

(ক) কৈশোর অপরাধ-এর সংজ্ঞা দিন। কৈশোর অপরাধ ও কৈশোর অপরাধীর মধ্যে তফাৎ কি? ভারতবর্ষে এই সমস্যার বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(খ) কৈশোর অপরাধের পেছনে কি কি কারণ থাকে তা বর্ণনা করুন। এই সমস্যা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

(গ) কৈশোর অপরাধীদের পরিচর্যার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

(ক) ডঃ বি. আর. কিশোর—ইন্সিডেন্স এন্ড ক'সেস অব জুভেনাইল ডেলিনকুয়েন্সি।

(খ) ডঃ সুশীল চন্দ্র—সোশ্যিওলজি অব্ ডেভিয়েসান ইন ইন্ডিয়া।

(গ) রাজনাথ খান্না—জুভেনাইল টেন্ডেন্সী এন্ড স্কুল।

(ঘ) এস. এস. শ্রীবাস্তভ—জুভেনাইল ভ্যাগর‍্যান্সী।

(ঙ) ডঃ ভি. জগন্নাথন—প্রিভেন্শান্ অফ্ জুভেনাইল ডেলিনকুয়েন্সি।

একক ১২ ❑ যুবসম্প্রদায়ের সমস্যা

গঠন

১২.১ ভূমিকা

১২.২ ধারণা

১২.৩ বৈশিষ্ট্য

১২.৪ সমস্যার বিশ্লেষণ

১২.৫ যুব বিক্ষোভ, আন্দোলন ও নেতৃত্ব

১২.৬ যুব কল্যাণ নীতি

১২.৭ আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ

১২.৮ অনুশীলনী

১২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ ভূমিকা

পৃথিবীর প্রায় সব দেশের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য যে যুবকেরাই দেশের প্রধান শক্তি। দেশের অগ্রগতি ও ভবিষ্যতের সাফল্য অনেকটাই যুবশক্তির উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক দেশের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে প্রত্যেক আন্দোলন বা বিপ্লবের ক্ষেত্রে যুবশক্তির অবদান সবচেয়ে বেশি। কিছু প্রবীণ নেতৃত্বের পরামর্শের আড়ালে থেকেই যুবশক্তি মূল দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাদের ত্যাগ ও অনুপ্রেরণা দিয়েই প্রতিটি আন্দোলন সাফল্য লাভ করে থাকে। যার ফলে বীর সৈনিক বিবেকানন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মনীষীদের কণ্ঠে যুবশক্তির জয়গান ধ্বনিত হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা বলে গেছেন যে কেবলমাত্র যুবক, যুবকেরাই পারে দেশের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। যুবকদের উজ্জীবিত করতে, তাদের মধ্যে সচেতনতা, সাহস ও উন্মাদনা সঞ্চার করতে এবং দেশগঠনের কাজে তাদের ভূমিকা মজবুত করতে এইসব মনীষীগণ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

১২.২ ধারণা

যুবসম্প্রদায় কারা? অন্যভাবে বলতে গেলে যুবসম্প্রদায়ের ধারণাটি কি? এসব প্রশ্নের উত্তর নিঃসন্দেহে কঠিন এবং বহুধা বিভক্ত। সাধারণভাবে যুবসম্প্রদায় বলতে বোঝায় তরুণ বয়সের সেইসব মানুষ যাদের অসীম সাহস, অফুরন্ত প্রাণশক্তি, বলবান ও উদ্যমী। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে "যুবসম্প্রদায় বলতে একটি নির্দিষ্ট বয়ঃগোষ্ঠীর সাথে আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যক্তিদের বোঝানো হয়।" এটি হলো একটি সামাজিক জগৎ থেকে অন্য এক সামাজিক জগতে রূপান্তরের সময়কাল। কখনো কখনো আমাদের নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা নির্দিষ্ট বয়সকেই যৌবনকাল বলে ব্যাখ্যা করে থাকি। কিন্তু এই বয়স বা আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে যুবসম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা দেওয়া নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ। যাই হোক, যুবসম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা দিতে আমরা সরকারী নিয়ম অনুসরণ করতে পারি। এই নিয়মে বলা হয়েছে যে ১৫-৩৫ বছর বয়ঃগোষ্ঠীর মানুষকেই যুবসম্প্রদায় বলে বিবেচনা করা হবে। কিছুকাল আগে এই নিয়মেরও পরিবর্তন করা হয়েছে। এই পরিবর্তিত নিয়মানুসারে যুবসম্প্রদায়কে দু-ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমতঃ, সন্নিহিত যুবসম্প্রদায় (Adjacent youth), মূলতঃ ১২-১৯ বছর বয়স্কদের বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, পরিণত যুবসম্প্রদায় (Matured youth), মূলত ২০-৩৫ বছর বয়সীদের বলা হয়েছে। কিন্তু ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারতবর্ষে ১৫-৩৫ বছর বয়সী মানুষদের যুবসম্প্রদায় হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়।

দেশভিত্তিক বয়সের এই মানদণ্ড দিয়ে যুবসম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন শ্রীলঙ্কায় ১৫-২৯ বছর বয়সীদের বলা হয়ে থাকে যুবক-যুবতি, মালয়েশিয়ায় ১৫-৪০ বছর বয়সীদের, পাকিস্তানে ১৮-৩০ বছর বয়সীদের, ব্রুনেইতে ১৫-৩৫ বছর বয়সীদের, সিঙ্গাপুরে ১৫-৩০ বছর বয়সীদের এবং হংকং-এ ১০-২৪ বছর বয়সীদের যুবসম্প্রদায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জে ১৫-২৪ বছর বয়সীদের যুবসম্প্রদায় হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

১২.৩ বৈশিষ্ট্য

যুবসম্প্রদায়ের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্য বলতে কিছু বিশেষ ধরনের গুণাবলী যা অন্যদের

থেকে আলাদা বলে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। তাদের সাথে বয়স্কদের বা শিশুদের আচরণগত বা ব্যবহারগত কিছু তারতম্য খুব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

★ তারা শিহরিতপ্রাণ (vibrant)

★ তারা তেজোময় ও উদ্যমী

★ তারা আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল

★ তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার গণ্ডি সীমিত

★ তাদের ধৈর্যশক্তি খুবই কম ও যে কোন কাজের তাৎক্ষণিক ফল আশা করে।

★ শ্রেয়'র চাইতে 'প্রেয়'র প্রতি তাদের প্রীতি বেশী।

★ তাদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতাও বেশি এবং ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে তারা উৎসাহী হয়।

★ তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয় ও স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে।

★ তাদের হৃদয়ে থাকে ভালোবাসার দুর্নিবার টান।

এই ধরনের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকার ফলে যুব সমাজকে অন্যদের থেকে আলাদা করাটা খুব সহজ হয়।

১২.৪ সমস্যার বিশ্লেষণ

সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মতো যুবসম্প্রদায়েরও বিশেষ ধরনের কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

(ক) সারা বিশ্ব জুড়ে বেকার ও আংশিকভাবে নিযুক্ত যুব সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি অতীতের সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে গেছে। বিশ্ব কর্মসংস্থান প্রতিবেদনে (World Employment Report 1998-99) এই পরিস্থিতিকে ভয়ানক এবং আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে চলেছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন অনুসারে প্রায় ৭৫০-৯০০ মিলিয়ন মানুষ অর্থাৎ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ আংশিকভাবে নিযুক্ত বলে জানা গেছে। প্রায় ৬০ মিলিয়ন মানুষ (যারা ১৫-২৪ বছর বয়ঃগোষ্ঠীভুক্ত) ভীষণভাবে কাজের সন্ধানে ব্যস্ত বলে দাবি করা হয়েছে। ফলে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে ভারতীয়দের মধ্যে বেকারত্ব ও আংশিকভাবে নিযুক্ত থাকার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা

হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। ব্যাপকহারে বেড়ে চলা বেকারত্ব ভারতের মতো দেশে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

(খ) এই দেশের বয়ঃসন্ধিকালীন অপুষ্টি একটি ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে, কারণ দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক এখনও দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। অপুষ্টিজনিত সমস্যা বয়ঃসন্ধিকালীন বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে বিশেষ করে এই বয়সের মেয়েদের কম বয়সে বিয়েও মাতৃত্বজনিত কারণে সামগ্রিক বৃদ্ধি ও বিকাশে নানান প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায়।

(গ) বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষেও প্রতি বছর হাজার হাজার কিশোরী অপহরণ ও নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে। যেমন—ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশে প্রায় ৯,০০,০০০ যৌনকর্মীদের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের নিচে। ইউরোপের পাশ্চাত্য দেশে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫,০০,০০০ মহিলা ও কিশোরী পাচার ও যৌন নিগ্রহের শিকার হয়। স্বভাবতই, তরুণে প্রজন্মের কাছে এই সমস্যা অত্যন্ত সংবেদনশীল।

(ঘ) বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিয়ে করার প্রবণতা কিছুটা হ্রাস পাবেই কিন্তু যৌন সম্পর্ক গড়ার আগ্রহ কমছে না। বহু সংখ্যক তরুণ-তরুণী সান্ধ্যকালীন বিনোদন হিসাবে ইন্টারনেটে ও বিভিন্ন ওয়েবসাইটে নানান রকমের অশ্লীল ছবি ও দৃশ্য নিয়ে মেতে থাকছে। যেখানে নিয়ামক কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণে অক্ষম। সারা বিশ্ব জুড়ে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সাইবার কাফে ও নৈশ ক্লাবের জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

(ঙ) বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য সেবনের সমীক্ষা ও গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এইসব দ্রব্য সেবনের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। ভারতবর্ষে মাদকদ্রব্য সেবনের অনুপাত হিসাব করলে দেখা যাবে ১৮-২৯ বছর বয়সের কোন না কোন যুবক-যুবতি এই দ্রব্য সেবন করেছেন এমন সংখ্যা শতকরা ২২ ভাগ। কোন কোন রাজ্যে এই সংখ্যা অত্যন্ত বেশি।

(চ) সারা বিশ্ব জুড়ে যত মানুষ মারা যায় তার প্রায় অর্ধেক সংখ্যায় থাকে ১০-২৪ বছরের তরুণ-তরুণী। পথ দুর্ঘটনা ও জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় কম বয়সীদের মধ্যে মৃত্যুই বেশি ঘটে থাকে। ভারত, থাইল্যান্ড, উগান্ডা ও জিম্বাবোয়েতে প্রতি বছর প্রায় ১০,০০০ যুবক-যুবতি মারা যাচ্ছে HIV/AIDS-এ আক্রান্ত হয়ে।

(ছ) দীর্ঘদিন ধরে পড়াশোনা ও অধ্যবসায়ের ফলে এবং ন্যায্য আইনগত অধিকার ভোগে বঞ্চিত হয়ে যুবসম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ অনেক দেরিতে সমাজস্বীকৃত যৌনজীবনে প্রবেশ করছে ফলে

তাদের যৌবনকাল অন্ধকারে চাপা পড়ে যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বে দিনে প্রায় ৫৫,০০০ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে যার প্রায় ৯৫% সম্পূর্ণ বিপজ্জনক ও নিরাপদ নয় এমন। যাদের বেশিরভাগ ভুক্তভোগীই যুবতি বা অল্প বয়সী মহিলা।

(জ) বোধশক্তির অভাবে এবং ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ না পেয়ে যুবসমাজের একটি বড় অংশ আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ববিভাগের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রতি ১০০ জন বালিকার মধ্যে ২২ জন এবং প্রতি ১০০ জন বালকের মধ্যে ১৮ জন আত্মহত্যার পথে যেতে চেয়েছে বা সেই ধরনের প্রবণতা রয়েছে। এই আত্মহত্যার পথ অবলম্বনের পেছনে অনিশ্চিত ভবিষ্যত ও বর্তমান পরিস্থিতিতে নানা কারণে অসন্তোষ সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে। একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধে দেখা গেছে যে ভারতবর্ষের চণ্ডীগড়ে শহুরে কর্মরত মহিলাদের ৩০-৩৫ বয়ঃগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাধিক আত্মহত্যার ধারণা মাথায় এসেছে। জাতীয় অপরাধ নথিভুক্তকরণ বিভাগের (National Crime Record Bureau) ১৯৯৬ সালের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে ৮৮২৪১ টি আত্মহত্যার ঘটনার মধ্যে ৩৮% হলো ১৫-২৯ বছর বয়সী এবং ৩৩% মাঝারি বয়সের মধ্যে পড়ে। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে আত্মহত্যার হার ৬২·৩৪ শতাংশ বাড়ে, অর্থাৎ যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান হতাশা ও অসচ্ছলতাই এর পেছনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে।

উপরোক্ত সমস্যা ছাড়াও যুবসম্প্রদায় আরও যে সব সমস্যায় জর্জরিত হয়ে থাকে, তার কয়েকটি কারণ হল—

★ প্রযুক্তিগত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার অপর্যাপ্ত আয়োজন।

★ মনঃ সমীক্ষা (Counselling) ও পরামর্শদানের অভাব।

★ অস্তিত্ব ও পরিচিতির অভাব।

★ অভিভাবকত্বজনিত দ্বন্দ্ব।

★ উপযুক্ত সময়ের আগে বিয়ে ও পিতামাতা হওয়া, বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে।

★ রাজনীতিবিদ বা বিভিন্ন ধরনের স্বার্থান্বেষীদের শিকার হওয়া।

★ বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক ও সমাজবিরোধী কাজকর্মে যুক্ত হওয়া।

★ হতাশা, বিষণ্ণতা ও সহানুভূতিহীনতার শিকার।

★ খেলাধুলা, ক্রীড়ানুষ্ঠান ও সৃজনশীল কাজকর্মের যৎসামান্য আয়োজন

★ মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের শিকার হওয়া।

উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশের অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুবক ও যুবতীদের বেশীরভাগ কোন না কোন সমস্যায় জর্জরিত হয়। সামাজিক পরিবেশ তাদের আনন্দদানের, জীবন বিকাশের, সম্ভাবনা প্রকাশের এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে সাহায্যকারী হয়ে উঠতে পারছে না।

১২.৫ যুব বিক্ষোভ, আন্দোলন ও নেতৃত্ব

ভারতের স্বাধীনতালাভের আগে ও পরে যুবসম্প্রদায় তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে তাদের ভূমিকা আরও সক্রিয় হয়। জাতীয় দুর্যোগের সময় উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে যুবসম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কিছুদিন আগেও দেখা গেছে যুবসম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ তাদের নিজেদের স্বার্থে ও নানান দাবি নিয়ে জোরালো আন্দোলন সংগঠিত করেছে। বিগত কয়েকদশকে তাদের আচরণগত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বহু যুবক-যুবতি নিজেরা উদ্যোগী হয়ে নিজেদের সংগঠন স্থাপন করছে যেমন—ছাত্র সংগঠন, যুব সংগঠন, মহিলামণ্ডলী প্রভৃতি। এইসব সংগঠন সংগঠিতভাবে ও ধারাবাহিকভাবে গঠনমূলক কাজকর্ম রূপায়ণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে এইসব যুবসংগঠন ও মহিলা সংগঠনগুলি বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে উদ্যোগ নিচ্ছে। সাক্ষরতার কর্মসূচি, বনসৃজন, সচেতনতা শিবির, রক্তদান শিবির, HIV/AIDS-এর প্রতিরোধ আন্দোলন প্রভৃতি বিশেষ সাফল্য অর্জন করে মূলত দেশের যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে। দেশের জরুরী অবস্থার মোকাবিলাতেও যুবসমাজের মধ্যে বেশ সাড়া পাওয়া যায়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, একদিকে যেমন বিভিন্ন দাবি নিয়ে আন্দোলন ও বিক্ষোভ সমাবেশে উদ্যোগী হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি দেশের নানান গঠনমূলক কাজেও যুবসমাজ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

যুবসমাজ কেবলমাত্র হিংসাত্মক, ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা বা ব্যবহারের শিকার হয় তা নয়, তারা দেশের গঠনমূলক কাজেও ব্রতী হয়। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর প্রায় পাঁচ লক্ষ যুবক-যুবতি নানান রকমের গঠনমূলক কাজে ও উন্নয়নমূলক কাজে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করে চলেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও লক্ষাধিক পুরুষ ও মহিলা দেশের সেবায় জীবনের মূল সময় ব্যয় করে থাকে। একবিংশ শতকে সমাজ গঠনে ও সামাজিক পরিবর্তন সাধনে যুবসমাজের শক্তি ও গতিশীলতার দ্বার খুলে যেতে পারে। তাদের মধ্যে থাকা অসাধারণ শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে গঠনমূলক সম্ভার গড়ে তোলা যেতে পারে। ১৯৮৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক যুববর্ষ' বলে ঘোষণার পাশাপাশি আমাদের দেশে যুব সমাজের আদর্শ,

তাদের কল্পনা ও তাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে মর্যাদা দেওয়া হয় এবং তাদের অংশগ্রহণে স্থায়ী সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনুরূপভাবে পরবর্তীকালে ১৯৯৫ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে (General Assembly) যুবকদের সার্বিক বিকাশে দেশের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য বিশ্ব যুবসম্প্রদায়-এর কর্মসূচি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ফলে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ে। অন্যদিকে আবার ১৯৯৮ সালে কমনওয়েলথ যুব শাখা যুব সমাজের ক্ষমতায়নের জন্য কর্মসূচি পরিকল্পনা (Plan of Action for Youth Empowerment বা PAYE) রচনা করে। ২০০৫ সালের এই কর্ম পরিকল্পনায় বলা হয়—"যুবসমাজের তখনই ক্ষমতায়ন হয়, যখন তাদের নিজেদের জীবনে নিজেদের পছন্দ করাটা স্বীকৃত হয়, সেইসব পছন্দের তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন থাকে, স্বচ্ছন্দে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করতে পারে এবং সেই কাজের উদ্ভূত ফলাফল এর দায়িত্ব গ্রহণ করে।" দেশের সরকার এবং নাগরিক সমাজকে যৌথভাবে যুবসমাজের বৃদ্ধির অনুকূল ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

১২.৬ যুব কল্যাণ নীতি

যুব সমাজের মান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সুপরিকল্পিত ও বাস্তবোচিত নীতি গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। অক্সফোর্ড ডিক্সনারি অনুসারে নীতি (Policy) হলো সরকার বা কোন ব্যক্তি বা কোন দল যা করবে বলে ঠিক করে বা সম্মত হয়, তাকেই বোঝায়। আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য 'নীতি' বলতে বুঝব একগুচ্ছ নির্দেশিকা যা সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কিভাবে চলা যায় বা ভাবা যায় তার সুচিন্তিত পথ বলে দেয়। উন্নত দেশগুলোত যুব সমাজের সামগ্রিক মান উন্নয়নের জন্য যুবনীতি প্রণয়ন ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দায়িত্ব নির্দিষ্ট করার কথা ভাবা হচ্ছে। ভারতবর্ষেও যুবনীতি প্রণয়নে এবং যুবসমাজের কল্যাণসাধনে অর্থবহ ও পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই নীতি প্রণয়নের জন্য ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে প্রকৃতিগতভাবে যুব সমাজের দুটো পৃথক ধারা চিহ্নিত করা হয়।

প্রথমত, তারা সংবেদনশীল, উদ্যোগী, আদর্শবান, নিঃস্বার্থপর, শক্তিশালী ও অভিনব ভাবনার অধিকারী।

দ্বিতীয়ত, তারা অবাধ্য, বিদ্রোহী ও বিশৃঙ্খল।

যুব সমাজের জন্য বাস্তবোচিত নীতি রচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষজনকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিশেষভাবেই সহায়তা করে। যেমন—

★ ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় গোঁড়ামি।

★ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান।

★ বিশেষ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত দারিদ্র্যতা।

★ বেকারত্ব ও আংশিক নিয়োগের হার বৃদ্ধি।

★ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিরক্ষতার উচ্চহার।

★ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগের অভাব।

★ যুবসম্প্রদায়ের প্রান্তিকীকরণ (marginalisation)।

★ লিঙ্গ ও জাতিভেদে অসাম্যতা।

★ খেলাধুলা ও গঠনমূলক সৃজনশীল কাজের অভাব।

★ কিশোর অপরাধী ও অপরাধ উভয়ের হার বৃদ্ধি।

★ মদ্যপান ও নেশাগ্রস্ততার কুপ্রভাব।

★ নির্যাতন, অপহরণ, মহিলাদের উপর অত্যাচার ও ধর্ষণের প্রবণতা বৃদ্ধি।

★ প্রযুক্তিগত দক্ষ লোকজনের অভাব।

দেশের যুবসম্প্রদায়ের জন্য উপযুক্ত নীতি প্রণয়নের সময় উপরোক্ত বিষয়গুলো যেমন সহায়ক হয় অন্যদিকে তেমন সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যবস্থাও করা হয়। এই ধরনের নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে যুবসম্প্রদায়ের নিজেদের সামগ্রিক বিকাশের পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক বিকাশে তাদের অবদান ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের অনেকের মধ্যে ধারণা আছে যে, সরকারই যুব সমাজের উন্নয়ন ও তাদের সামগ্রিক বিকাশের কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করে থাকে। কিন্তু এ কাজে আজকাল বহু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ সংস্থা, পরিবার, বণিক সভা, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি এগিয়ে আসছে এবং এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এই ধরনের নীতি প্রণয়নে সরকার বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অবদান সক্রিয়ভাবে থাকার ফলে তার সুদূরপ্রসারী ফল অর্জন এবং যুবসম্প্রদায়ের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সমষ্টির ক্ষেত্রেও তার প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভালোই হোক আর মন্দ, জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে এই নীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। কোথাও ব্যক্তি হিসাবে,

কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে এই নীতি বা কর্মপন্থার প্রভাব যুব সমাজের উপর পড়ে থাকে। কারণ যুব সমাজ তাদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য মূলতঃ সমাজ প্রদত্ত সেবার উপর নির্ভরশীল।

বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ তাদের যুবসম্প্রদায়ের সামগ্রিক বিকাশের জন্য কোন না কোন নীতি প্রণয়ন করেছে। ১৯৯৫ সালে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে অনুষ্ঠিত সভায় কমনওয়েলথ-এর যুব বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলেছিলেন যে, "প্রতিটি সদস্যভুক্ত সরকারের (কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত) ২০০০ সালের মধ্যে যুব সমাজের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা থাকবে যেখানে দেশের যুব সমাজের জন্য সরকারের দায়বদ্ধতার বিষয়টি উল্লিখিত থাকবে। সেই দায়দায়িত্ব পূরণের জন্য কোথাও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রয়োজন হতে পারে। আবার জাতীয় স্তরে আলোচ্য সূচি হিসাবে যুব সমাজের বিষয়গুলো উঠে আসতে পারে।

একথা অনস্বীকার্য যে দেশের যুব সমাজের জন্য কর্মপন্থা রচনা করা মানেই সেই দিন থেকে যুব সমাজের অবস্থার উন্নতি ঘটতে শুরু করবে। যদি সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার নিশ্চিত হয় যে, সেই কর্মপন্থার বাস্তবায়নে যুব সমাজের প্রকৃত সমস্যা কতটা সমাধান করা যাবে, তাহলেই তা সম্ভব। সুতরাং কর্মপন্থা রচনার দিন থেকেই সংশ্লিষ্ট সরকারকে যুব সমাজের কল্যাণের জন্য গৃহীত কর্মসূচী ও কলাকৌশল স্বার্থকভাবে রূপায়ণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হয়।

যুব সমাজের জন্য গৃহীত কর্মপন্থায় নানান সুযোগ/প্রয়োগ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। যুব সমাজের উন্নয়ন ও সামগ্রিক কল্যাণ সাধনায় এইসব ক্ষেত্রগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশভিত্তিক সেইসব ক্ষেত্র আলাদা আলাদা হলেও তাদের জন্য গৃহীত কর্মপন্থায় যেসব উপাদান সংযুক্ত করা হয়, তার কয়েকটি নীচে তুলে ধরা হল।

★ যুব সমাজের উন্নয়নের জন্য স্বচ্ছ দূরদর্শিতা প্রদর্শন।

★ নীতি ও মূল্যবোধ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবৃতিদান।

★ ভবিষ্যতে কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি।

★ যুব সমাজের জন্য রচিত কর্মপন্থার উদ্দেশ্য, জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি স্থাপন।

★ লিঙ্গবৈষম্য বর্জিত একটি দলিল।

★ যুব সমাজের সমস্যা ও ভবিষ্যত অগ্রগতির প্রতি সামগ্রিকভাবে নজরদান।

★ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বা পদাধিকারীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি দলিল।

★ নতুন প্রজন্মের জীবনপঞ্জী পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট দলিল।

কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যখন যুব সমাজের জন্য কোন কর্মপন্থা রচনা করতে যায়, তখন বেশ কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হয়। যেমন—

★ গুণগত ও পরিমাণগত লক্ষ্য পূরণের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল থাকা।

★ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা (নির্দিষ্ট, পরিমেয়, লক্ষ্যপূরণ সাপেক্ষ, বাস্তবসম্মত, সময় নির্দিষ্ট বা Specific, Measurable, Achierable, Realistic and Time-bound-SMART)

★ যুবসম্প্রদায়ের সঙ্গেও সমষ্টির লোকজনের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করেই প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করা।

★ উদ্দেশ্যমূলক ও গভীরভাবে পর্যালোচনার সুযোগ থাকা।

★ কাজের বিস্তৃতসূচক ও সাধারণ সীমারেখা থাকা।

★ বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর যুব সমাজের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের কর্মপন্থার ব্যাখ্যা থাকা প্রভৃতি।

১২.৭ আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ

সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যুব সমাজের প্রতি গুরুত্ব প্রদান ও তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জের ৩৪তম সাধারণ সভায় ১৯৮৫ সালকে আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ হিসাবে পালন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই দিবস পালনের মূল্য বিষয় হিসাবে তাদের "অংশগ্রহণ, উন্নয়ন ও শান্তি"র জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যুব সমাজের ভূমিকা বিশেষভাবে তাৎপর্য্যপূর্ণ। উন্নয়নমূলক কর্মপন্থার দৃষ্টিভঙ্গিতে যুব সমাজের অবদান, তাদের ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, শেখার আগ্রহ ও বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার অদম্য ইচ্ছার জন্য এইসব দেশে তাদের সম্ভাবনাময় শক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই ধরনের স্বভাব ও গুণাবলীর জন্য দেশের সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুব সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই জন্যই আমাদের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মপন্থায় যুব সমাজকে ও যুব সংগঠনকে কাজে লাগানোর বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়ার দরকার হয়। এই ধরনের যুব সংগঠন সরকারী বা বেসরকারী নানান উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণে সহায়তা করে থাকে। এমনকি সমষ্টির চাহিদা ও সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের উদ্যোগেও

নানা রকম কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। সরকার এইজন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নানান রকম উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই ধরনের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কাজ করার বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার তার নানান কর্মকাণ্ডে সমষ্টির মানুষজন (বিশেষ করে যুব সমাজ)-এর অংশগ্রহণের নানান উপায় অবলম্বন করছে। দেশের গঠনমূলক কাজে ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। যুব সমাজের অংশগ্রহণেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব এবং তার জন্য দেশের যুবশক্তিকে জাগানো ও তাদের প্রাণশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা খুবই জরুরী। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুব সমাজের অংশগ্রহণ মানেই তাদের নিজেদের উন্নয়ন ও সামগ্রিকভাবে সমষ্টির উন্নয়নও হয়ে থাকে। যে কোন কর্মসূচির সার্থক রূপায়ণ সমষ্টির অংশগ্রহণের পাশাপাশি যুব সমাজের অংশগ্রহণের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বহুক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয় না বা উৎসাহ দেওয়া হয় না। কারণ সে বিষয়ে চিরাচরিত উদাসীনতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞার অভাব ও সংকল্পগ্রহণের মানসিকতার অভাব। গ্রামীণ অঞ্চলে বিভিন্ন কর্মসূচির আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত না হওয়ার পেছনে যুব সমাজের অংশগ্রহণকেই দায়ী করা হয়। আমাদের ধারণা আছে যে, যেখানে সাক্ষরতার হার কম সেখানে সমষ্টির অংশগ্রহণও কম। অন্যদের অর বিপরীত ধারণাও আছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে নিরক্ষর সমষ্টিতেও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ানো যেতে পারে, যদি তাদের উপযুক্তভাবে সংঘবদ্ধ করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বের মধ্যে সেই সম্ভাবনা ও সদ্‌ভাবনা থাকে।

আমাদের অগ্রগতি ও সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণের লক্ষ্যে শান্তি বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে যা পরিস্থিতি তাতে শান্তি নানাভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। শান্তির বার্তাবাহক হিসাবে মহাত্মা গান্ধী সবকিছুর বিনিময়ে দেশের শান্তিরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেশের মানুষ এখনও তাঁকে স্মরণ করে। এখনও মানুষ বিশ্বাস করে যে, দেশের অগ্রগতির জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা একান্ত জরুরী। ধ্বংস মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। যদিও বহুমত, বহু মতবাদ এখানে থাকতে পারে। অনেকে মনে করতে পারেন যে দেশের উন্নয়নে শান্তির কোন ভূমিকা নেই। এমনকি শান্তি মানুষকে অলস ও অকর্মণ্য করে দেয়। অন্যদিকে কেউ কেউ আবার মনে করেন যে একটা প্রতিযোগী পরিস্থিতি দুর্দান্ত ফল দেয়, মানুষকে ঘুম থেকে টেনে তুলে আনে সেই প্রতিযোগিতায় নামার জন্য এবং ত্যাগের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আন্তর্জাতিক যুব বর্ষের তিনটি উপাদান একে অপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যা যে কোন দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কমনওয়েলথ দেশভুক্ত একটি সদস্য দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ ১৯৮৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ' হিসাবে পালন করে।

এই আন্তর্জাতিক যুব বর্ষে কতকগুলো উদ্দেশ্যে সাধিত হয়। যেমন—

★ সাধারণের মধ্যে যুব সমাজের প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনার নানান দিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

★ যুব সমাজের নিজেদের মধ্যে সচেতনতার বিস্তার ঘটানো হয়।

★ যুব সমাজের কল্যাণ সাধনায় সরকারী বিভাগ ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর উপযুক্ত ভূমিকা নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো হয়।

★ যুব সমাজের কল্যাণে কিছু অর্থবহ কর্মসূচীর সূচনা করা হয়।

★ জাতীয় অগ্রগতিতে যুব সমাজের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে ভাবা হয়।

উপরোক্ত নানাবিধ উদ্দেশ্য পালনের কথা মাথায় রেখেই সমগ্র দেশ জুড়ে যুব বর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী নানা বিভাগের পাশাপাশি যুব সমাজের একটি বড় অংশের মধ্যে এই বছরটিতে বিশেষ উন্মাদনার সঞ্চার হয়।

১২.৮ অনুশীলনী

(ক) যুবসম্প্রদায় বলতে কি বোঝায়? যুবসম্প্রদায়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(খ) আজকের যুবসম্প্রদায় নানান রকমের সমস্যায় জর্জরিত।—সেগুলি কি কি?

(গ) আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ পালনের যৌক্তিকতাসহ এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত রচনা লিখুন।

(ঘ) বিক্ষোভ কি? ভারতবর্ষে কি ধরনের যুব বিক্ষোভ সংগঠিত হয় এবং তার কারণগুলো কি কি?

১২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

(ক) Youth Welfare In India, —L. J. Kudchedkar.

(খ) Encyclopaedia of Social Work in India, Vol-II, Social welfare Deptt. govt. & India.

(গ) Social Welfare in India, Social Welfare Department, govt. of India.